বাংলাদেশ '৭৩

বাংলাদেশ '৭৩

সংস্কৃতি সংসদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের — ভাষা ও স্বাধীনতা বিশেষ প্রকাশনা। সম্পাদনা করেছেন, সংস্কৃতি সংসদের সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে শাহরিয়ার কবির। প্রকাশ করেছেন, সংসদের সভাপতি মুনতাসীর মামুন। প্রচ্ছদ এঁকেছেন, কাজী হাসান হাবিব।

বাংলাদেশঃ একুশ থেকে ছাব্বিশ

বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে এদেশে যে গণ জাগরণের সূচনা হয়েছিল, একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ ছিল সেই জ্বলন্ত সত্যেরই পরিণত অবয়ব। ভাষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্রীক প্রতিরোধ বাংলাদেশে ক্রমশঃ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে রূপ পেয়েছিল। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে বাংলাদেশ অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পরও বাংলাদেশের সংগ্রাম শেষ হয়নি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি যতদিন না আসবে, ততদিন এদেশের মেহনতি মানুষের সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে, যাদের কাছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন।

সংগ্রামের এই নবতর প্রেক্ষিতে আমাদের জানতে হবে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থাকে। আমাদের সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থানের পটভূমিতে সংগ্রামের নতুন দিক চিহ্ন সুস্পষ্ট অবয়বে প্রকাশ পাবে। ক্রান্তিকালের এই বিশেষ মুহূর্তে 'বাংলাদেশ '৭৩' এর প্রকাশ অত্যন্ত নগন্য ভূমিকা পালন করলেও এর প্রয়োজন আছে। এই যুগ সন্ধিক্ষণ আমাদের আত্মোপলব্ধির সময় —অবিস্মৃত সত্য হিসেবে আমাদের গ্রহণ করা উচিৎ।

—সম্পাদক

সমাজবিজ্ঞানঃ বাংলাদেশে

বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান বর্তমানে একটা মৌল সমস্যার সম্মুখীন। সমস্যাটা হচ্ছে : পদ্ধতি; পদ্ধতির ক্ষেত্রে অগ্রসর হব বাস্তবিক, ব্যবহারিক দিক থেকে ? কিংবা অগ্রসর হব ভিন্নতর দৃষ্টিকোন থেকে ?

প্রাত্যহিক জীবনের অব্যবহিত প্রয়োজন থেকে উৎসারিত হচ্ছে বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানের সমস্যাবলী। ঐ সব রূপ নিচ্ছে পরিকল্পনার এবং যৌথ উদ্যোগের, লক্ষ্য হচ্ছে 'সামাজিক' সমস্যা নিরসন করা। সে জন্য সমাজ বিজ্ঞানের দায়িত্বের অন্তর্গত হচ্ছে সমাজনীতির বিষয়। জনগণ, প্রশাসক, রাষ্ট্র ও সমাজের পরিচালকগণের দাবী তাই : সমাজ বিজ্ঞানের মতন বিশেষ জ্ঞানকে ব্যবহারিক বাস্তবিক প্রয়োজন মেটাতে হবে।

অমন দাবী অভিজ্ঞতাশ্রয়ী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উৎসারিত। তার সীমাবদ্ধতা : একক ঘটনাকে সমাজের ঊর্ণাজাল থেকে আলাদা করে দেখা। ঐ ঘটনা সমাজে জড়িত, আলাদা করার ফলে সমগ্র সমাজ জীবন বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। অভিজ্ঞতাশ্রয়ী দৃষ্টিভঙ্গি প্রশ্নমালার সীমিত পরিসরে নিজেকে আবদ্ধ করে বলেই আমাদের মধ্যে কতক জিজ্ঞাসার জন্ম দিচ্ছে। বাস্তবিক ব্যবহারিক সমস্যা পরীক্ষা করা নিশ্চয়ই দরকার। কিন্তু ঐ সব সমস্যা যদি স্বতন্ত্র করে পরীক্ষা করা করা হয় তাহলে সামাজিক সমস্যার সমগ্রতা অবহেলিত হয়, যদি বিশেষজ্ঞ খুটিনাটিতে নিজেকে জাগ্রত রাখেন তাহলে সামাজিক বাস্তবতার সমগ্রতা মুষ্টিবদ্ধ করার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ কমে যায়, কেবল সতর্কতা কিংবা পদ্ধতিগত সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণের জন্য তিনি সামান্য প্রকল্প থেকে দূরে সরে যান। বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ সঠিক নিরীক্ষণ যোগ্য স্বতন্ত্র তথ্যাবলী, কিংবা বিচ্ছিন্ন ঘটনা অথবা সম্পর্ক শুধু

নয়, বরং আন্তনির্ভরশীল ঘটনাবলীর সমাবেশ, এবং আরো : একটি কাঠামোগত সমগ্র। যদি আমরা সমগ্রকে খণ্ডে ভাগ করি, খণ্ডের সম্পর্কের কর্ম প্রক্রিয়ার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তাহলে, সমগ্রের সঙ্গে খণ্ডের সম্পর্কের প্রয়োজনীয় দিকটি আমাদের দৃষ্টি থেকে দূরে সরে যাবে। একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা কিংবা একটি সামজিক তাৎপর্য সঠিকভাবে বর্ণনা করা সম্ভব যদি তাকে জীবনের উদ্ভাসক এবং সমাজের কর্ম হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ, কাজ এবং বিশ্লেষণ আবশ্যক বৈজ্ঞানিক সত্য অর্জনের জন্য, কিন্তু কাজের অন্তেই, বিশেষজ্ঞ তাঁর দৃষ্টি ফেরাবেন সমগ্র সমাজ জীবনে এবং সমগ্রের দিক থেকে অংশ ব্যাখ্যানে ব্রতী হবেন। মনে হচ্ছে বাংলাদেশের সমাজ বিজ্ঞান বর্তমানে তত্ত্ব সমন্ধে নিদারুণ ভীত, পদ্ধতিগত সন্ন্যাসযোগে আক্রান্ত; ঐ যোগ একপক্ষে সামান্য তত্ত্বে ব্যবহারে প্রতিবন্ধক, অন্যপক্ষে ব্যবহারিক গবেষণা থেকে দূরবর্তী তত্ত্বের পরিপোষক। পরীক্ষা ছাড়া তত্ত্ব, মানসিক খেলা হিসাবে তত্ত্বের আলোচনার কোন দাম নেই। অন্যপক্ষে তত্ত্ব ছাড়া বাস্তব জানা বিভ্রান্তিকর। কিংবা তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ না করার ইচছা নিরাপত্তার বোধ থেকে উৎসারিত, ঐ বোধ বন্ধাত্বের ইঙ্গিতবহ।

তত্ত্ব সবন্ধে ঐ সন্ন্যাসীর দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে আছে 'দর্শন' সবন্ধে শংকা। মৌল প্রশ্নের আলোচনায় অনিচ্ছা প্রকাশ করা গবেষণায় সহায়ক নয়। দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যেকার বিভেদ বড়ো করে দেখা, কিংবা যে-কোন তত্ত্বকে 'দর্শন' বলে উড়িয়ে দেয়া, অব্যবহিত অভিজ্ঞতা বিদীর্ণকারী যে-কোন গঠনমূলক প্রকল্পকে ছেঁদো বলে নস্যাৎ করা সঙ্গত নয়। 'ধ্যানাত্বক' ও 'গঠনমূলক' মানসের মধ্যে আমাদের তফাৎ করতেই হবে। গঠণমূলক মানস অভিজ্ঞতাশ্রয়ী যে-কোন গবেষকের জন্য আবশ্যিক, সেক্ষেত্রে ধ্যানাত্মক মানস ক্ষতিকর। গঠণমূলক চিন্তা করার অর্থ : গঠনমূলক কল্পনা ব্যবহার করে একটা কাঠামো তৈরী করা, ঐ কাঠামোর অবস্থান ঘটনাবলীর মধ্যে, কিন্তু বাস্তবের খণ্ডিত পর্যবেক্ষণে তার নিরীক্ষণ সম্ভব নয়। বাংলাদেশের সমাজ বিজ্ঞানীরা তত্ত্বমূলক নির্মানের গুরুত্ব হয় তো অস্বীকার করেন না। কিন্তু পদ্ধতি ক্ষেত্রে, বড়ো ব্যাপার হচেছ, ঠিক মত থাকা নয়, ঠিক অনুযায়ী কাজ করা। অন্যপক্ষে 'অভিজ্ঞতাশ্রয়ী' সমাজবিজ্ঞান ঘটনাবলীর কাঠামোর মধ্যে তত্ত্বগত অন্তদৃষ্টি প্রক্ষেপনে অনিচ্ছুক। সঠিকতরে আদর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়ার আতঙ্কে

এ পরীক্ষা কম্পমান। তাঁদের লক্ষ্য হচ্ছে; সঠিক হওয়া, বিষয়ের জ্ঞান দেয়া নয়। এ ক্ষেত্রে আমি তো বলব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জ্ঞান দেয়া বড়ো, পদ্ধতির সঠিকতা নিয়ে দুশ্চিন্তামগ্ন হওয়া গৌণ। অন্যপক্ষে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁদের কাছে প্রবল আগ্রহ। যদিও এ স্বীকৃত যে সকল সমাজ ঘটনা পরিমাণযোগ্য নয়, তবু অনেকেই ঐ সঠিকতার আদর্শে উর্ধশ্বাস। সঠিকতার একটি নির্দিষ্ট আদর্শ গ্রহণ করার আগে জানা দরকার কোন্ আদর্শ বিশেষ ঘটনার উপযোগী। ‘পদ্ধতিগত সন্ন্যাসের’ অতিরঞ্জন প্রায়ই বৈজ্ঞানিক প্রেরণা ও সৃষ্টিশীলতার উৎস শুকিয়ে তোলে। সমাজ-বাস্তব জানার জন্য দরকার কল্পনার, বিশেষ ধরণের কল্পনার, যার নাম ‘বাস্তববাদীতা’, ঐ কল্পনা আপাত সম্পর্কহীন ঘটনাবলীকে কাঠামো-মূলক সহ-সম্পর্কের ধ্যানের মাধ্যমে গেঁথে তোলে। তার ফলে আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় বোঝা প্রতিটি তথ্য, এমনকি তুচ্ছাতিতুচ্ছ, কি করে ফ্রেমে গেঁথে যায়।

বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান ব্যাপক তত্ত্বের রেখাচিত্রণে সাহসী নয়, কিংবা সমগ্র হিসাবে সামাজিক জীবনের কাঠামোগত দিকে অন্বেষণের আলোক প্রক্ষেপনে উৎসাহী নয়। তার কারণ একপক্ষে তত্ত্বকে শুদ্ধ, কার্য কারণ ভিত্তিক তত্ত্বের সঙ্গে একাত্মকরণের ভয়, অন্যপক্ষে পর্যালোচনাকে প্রাত্যহিক সামাজিক, রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখার প্রয়াস। সেজন্য সমাজবিজ্ঞানী হয়ে উঠছেন গ্রন্থবিলাসী ব্যক্তি, সমাজ বিজ্ঞানের যেন কোন সামাজিক পটভূমি নেই; গবেষণায়রত ব্যক্তিদের সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত, চিন্তা বিনিময়ে আগ্রহ নেই।

বৈজ্ঞানিক আগ্রহের ভিত্তি, ভূমি, কেন্দ্র হচ্ছে চলিষ্ণু শক্তিসমূহ। ঐ শক্তি সমূহ সমাজের রূপান্তরণের প্রক্রিয়া নিরুপণ করছে। অবশ্য রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকবেই। তবু অন্যতম প্রশ্ন হচ্ছে সমাজ সংগ্রাম কি করে মানুষীচেতনা আকার দেয় ও নিরুপিত করে তা জানা। ঐ প্রশ্ন বর্তমানের সম্পর্কে শুধু নয়, ইতিহাসে, বুদ্ধিবাদী প্রক্রিয়ায় সমাজের বিপ্লব এবং শ্রেণী আধিপত্যের বদল কি ভাবে ঘটেছে সব ক্ষেত্রে তোলা যায়। অবশ্য এক ধরণের অহঙ্কার আছে শুদ্ধ ধ্যান দিয়ে তুড়ি মেরে বিরাট সমস্যা সমাধান করা যায়, তেম্নি আছে অভিজ্ঞতাশ্রয়ী সমাজবিজ্ঞানীর ছদ্মবেশী বিনয় ‘সঠিক’ জবাব সম্বন্ধে। সে জন্যে জরুরী হচ্ছে: সমাজ বিজ্ঞানের পদ্ধতিগত সমালোচনা,

প্রতিটিক্ষেত্রে অন্বেষন করা দরকার : কাজটা কোন যথার্থ সমাধানে ব্রতী কিনা। বিজ্ঞানের মালমশলা বেড়ে যাচ্ছে বলে বাছাই ছাড়া তথ্য সংগ্রহ বিপজ্জনক। মসলার ওপর নিয়ন্ত্রন হ্রাস বিজ্ঞানের প্রতি হুমকি হয়ে উঠছে। যথার্থ সমস্যা, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কাজ হচ্ছে সেইসব যারা নিজেদের আরোপ করে বিজ্ঞানের সাধারণ ধারার ভিত্তিতে, গ্রুপ চেতনা থেকে, বাঁচবার ইচ্ছা থেকে, জীবিকার সমস্যা থেকে।

অবশ্য এ সত্য যে কেন্দ্রীয় সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগের দরুন সমাজ বিজ্ঞানে মূল্য বিচার দেখা দেয়ার ভয় আছে। যদি ভয়, তা হলে আমরা সতর্ক হব, সেই পদ্ধতি গড়ে তুলব যার সাহায্যে রাজনৈতিক ঝোঁক খুঁজে বের করা, দূর করা সম্ভব। ম্যাক্স ভেবারের প্রয়াস এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ থেকে ঐ দৃষ্টিভঙ্গীর অনুপস্থিতি মনে হয় একটা ত্রুটি, পদের সরবরাহ, প্রশ্ন করার আঙ্গিক, সমস্যার গঠন ও গ্রুপিং ঐ ত্রুটির জন্যে দায়ী, ঐ ত্রুটির নিরসন সম্ভব ইতিহাসের অন্তরঙ্গ পরিচয়ের মাধ্যমে, ঐ পরিচয়ের সমান্তরালে থাকবে বিজ্ঞানের পরিউন্নয়ন ও সমাজের বিবর্তন। আসলে দুই দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পর বিরোধী বলেই পরস্পরের সাহায্যে আসতে পারে। অভিজ্ঞতাশ্রয়ী বিজ্ঞান আমাদের শেখায় : বিজ্ঞানীকে বাস্তবিক জীবনের সম্পর্কে আসতেই হবে। অন্যপক্ষে ঐ বিজ্ঞান ও ঐশ্বর্যবাক হবে যদি ব্যবহারিক খুটিনাটির পর্যালোচনা তত্বগত সমস্যা সম্পর্কে মনোযোগী হয়।

সমাজবিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে সমাজের প্রক্রিয়া ও কাঠামো এবং সামাজিক জীবনে অংশভাগ ব্যক্তিদের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করা ও বোঝা। ঐ কাজের পূর্বশর্ত হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞানী ঐ কাজের যোগ্য এবং সমাজ ঐ কাজের ফলাফল সহ্য করতে সক্ষম। বহুকারণের জন্যে ঐ পূর্বশর্ত সত্য হচ্ছে না। সমাজ বিশ্লেষণ সমালোচনাত্মক প্রত্যক্ষভাবে কিংবা তাৎপর্যের দিক থেকে। সমাজ যে-জোড়ার উপর দাঁড়িয়ে বিশ্লেষণ সেই জোড়া খুলে ধরে, লোকদের নিজেদের দেখতে বাধ্য করে।

সমালোচনামনস্ক সমাজ বিজ্ঞানীর গুণ অপরিহার্য : নিজের অভিজ্ঞতার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা এবং জীবন ও প্রতিষ্ঠানবলীর কেন্দ্রে নিজেকে

প্রক্ষেপন করার ক্ষমতা। সমাজস্থ সংগঠিত গ্রুপগুলির বিদ্যমান মূল্যবোধ ও মনোভঙ্গি থেকে নিজেকে নির্লিপ্ত করার ক্ষমতা। সে জন্য দরকার কতক পরিমান বিচ্ছিন্নতার। এ কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীদের পেশার কাঠামো ঐ সব শর্ত পূরণে সম্ভব নয়।

সমাজবিজ্ঞানীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন কিংবা অন্যান্য আমলাতান্ত্রিক ফ্রেমে চাকরী করেন। সময় এবং মনোযোগ ঐ সব পেশার প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁরা সমাজবিজ্ঞানকে ভাবতে অভ্যস্ত সেই ক্ষেত্র হিসাবে যাকে ব্যবহার করা যেতে পারে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যম হিসাবে। তাঁরা তৈরী করেন ভর্তির অনুশাসন, চাকরীর একচেটিয়া অধিকার, ব্যস্ত থাকেন তন্ত্রমন্ত্র পদ তৈরীতে। ঐ একাডেমিক এবং পেশাগত কারণেই ঐ একাডেমিক এবং পেশাগত অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে সমাজ বিজ্ঞানীর জগৎ বোঝার মাপকাঠি। এভাবেই সমাজ বিজ্ঞানের কাজ পর্য্যবসিত হচ্ছে মধ্যবিত্ত চাকরীজীবীর অব্যবহিত বাস্তবিক অর্থকরী জীবিকায়। সমাজ বিজ্ঞান হারাতে বসেছে সমালোচনার বোধ, ইচ্ছা করেই নষ্ট করছে সমাজবিজ্ঞানমূলক কাজ অগ্রসর করার ক্ষমতা এবং সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টি থেকে ঐ কাজ বিচার করার ক্ষমতা। সেজন্যই সমাজবিজ্ঞানকে বাংলাদেশে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার সময় এসেছে।

—বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর

বাংলাদেশের ভূমি সংস্কার

বৃটিশ শাসকশ্রেণী নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী শোষন ও আধিপত্য বিস্তার করার জন্য অবিভক্ত বাংলায় ১৭৯৩ সালে ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করে। উক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমির উপর হইতে কৃষকের মালিকানা কাড়িয়া নেওয়া হয় এবং মধ্যস্বত্ব ভোগী হিসাবে জমিদারশ্রেণীর ও জোতদারশ্রেণীর সৃষ্টি করা হয়।

সামন্তবাদী জমিদারী প্রথার ও বর্গা প্রথার শোষন ও অত্যাচার বাংলার কৃষকের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেয়। জমিদারী জুলুমের বিরুদ্ধে তখন কৃষকেরা পাবনা ও অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্রোহ ও করিয়াছে। কিন্তু তখন ঐ জুলুম ও অত্যাচারের অবসান হয় নাই।

বাংলাদেশে কৃষকদের সংগঠিত আন্দোলন শুরু হয় ১৯৩৭·৩৮ সাল হইতে। কৃষকদের সংগঠিত আন্দোলন ব্যপকতা লাভ করে-১৯৪৬ সালে। ১৯৪৬ সালে সারা বাংলাদেশে, বিশেষ করিয়া উত্তর বঙ্গের রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় বর্গাচাষীরা তে-ভাগার দাবীতে সংগ্রাম করে। বর্গাচাষীরা ফসলের দুই তৃতীয়াংশ দাবী করে এবং দাবী আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংগ্রাম করে। ঐ সময়ে ময়মনসিংহের পাহাড় অঞ্চলে টংক প্রথা (ধানুয়া খাজনা) অবসানের জন্য এবং সিলেটে নানকারে প্রথা অবসানের জন্য শক্তিশালী আন্দোলন হয়।

উক্ত আন্দোলনের ফলে নানকার প্রথার (গোলামী প্রথা) স্থানীয় ভাবে অবসান ঘটানো সম্ভব হয়। নানকার আন্দোলনের ফলে উক্ত অঞ্চলের নানকারদের বাড়ী ও অৰ্দ্ধেক জমির উপর জোতস্বত্ব স্বীকৃত হয়।

১৯৩৭-৩৮ সাল হইতে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ খোদ কৃষকের হাতে জমি, আধিবর্গার বদলে তে-ভাগা, টংক বা ধানুয়া খাজনার বদলে টাকায় খাজনা, মধ্যযুগীয় গোলামী প্রথা নানকার প্রথার অবসান প্রভৃতির দাবীতে জোরদার আন্দোলন হওয়ার ফলে বাংলার কৃষকেদের মধ্যে এবং জনগনের মধ্যেও একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

উক্ত আন্দোলনের চাপে জনিদার-জোতদার প্রভাবাধীন মুসলিম লীগ সরকারও জমিদারী প্রথা, ধানুয়া খাজনা প্রথা এবং নানকার প্রথার অবসান করিতে বাধ্য হয়। ১৯৫১ সালে তদানিন্তন মুসলিম লীগ সরকার ভূমি দখল আইন, পাশ করেন। উক্ত 'ভূমি দখল আইন', এর মাধ্যমে সামন্তবাদী জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা হয়, কিন্তু জমিদার শ্রেণীকে প্রচুর খেসারত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া, ধানুয়া খাজনার বদলে টাকায় খাজনা প্রবর্ত্তন করা এবং নানকার প্রথার অবসান করার ব্যবস্থাও উক্ত আইনে করা হয়।

উক্ত আইনে জমির সর্ব্বোচ্চ সীমা (ceiling) পরিবার প্রতি ১০০ বিঘা ধার্য্য করা হয়। কিন্তু, বাংলাদেশে যে সামন্তবাদী শোষণ প্রথা সবচেয়ে ব্যাপক, সেই বর্গা প্রথার কোন সংস্কারই ঐ সময়ে করা হয় নাই। জোতদারশ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখার জন্যই তদানিন্তন মুসলিম লীগ সরকার বর্গা প্রথার কোন রকম সংস্কারই করে নাই।

উক্ত আইনে পরিবার প্রতি ১০০ বিঘা সিলিং ধার্য্যের যে নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহাও জোতদারশ্রেণীর বাঁধা দানের ফলে কার্য্যকরী করা হয় নাই। বরং আইয়ুবের আমলে জোতদারশ্রেণীর স্বার্থে জমির সর্ব্বোচ্চ সীমা পরিবার প্রতি ১০০ বিঘার স্থলে ৩৭৫ বিঘা করা হয়। কিন্তু, উক্ত বিধান ও কার্য্যকরী হয় নাই।

ফলে গরীব ও ভুমিহীন কৃষকের জমি পাওয়ার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। বরং ইতিমধ্যে ঋণের দায়ে গরীব কৃষকের বহু জমি হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে এবং মহাজন, জোতদার ও ধনী কৃষকদের হাতে গিয়া জমা হইয়াছে। ফলে গরীব ও ভুমিহীন কৃষকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১০।১২ বৎসরের মধ্যে কোন পুর্ণ কৃষি সেনসায়ক হয় নাই। বর্ত্তমানে যেটুকু আংশিক তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বলা যায়

যে আমাদের দেশে বর্তমানে শতকরা প্রায় ৮০ জন কৃষকই গরীব ও ভূমিহীন। তন্মধ্যে শতকরা ৪০ জনই হইবে ভূমিহীন। এই ভূমিহীনদের সংখ্যা ক্রমশয়ই বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং তাহাদের একটা অংশ বেকার হইয়া পড়িয়াছে এবং রোজগারের জন্য শহরে আসিয়া পড়িতেছে।

গরীব ও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জোতদারশ্রেণীর পক্ষে বর্গা জমির জন্য সেলামী আদায় করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অর্ধেক ফসলের বদলে দুই তৃতীয়াংশ ফসল আদায় করার ব্যবস্থা করা ও সম্ভব হইয়াছে।

সামন্তবাদী মহাজনী শোষণ প্রথা ও আমাদের দেশে ব্যাপক ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাজন ও জোতদারা যে পরিমাণ টাকা বা ধান কর্জ্জ দেয়, তার দ্বিগুণ বা তিনগুণ পরিমাণ ধান বা টাকা আদায় করে। অনাদায়ে জমি নিয়া নেয়। মহাজনেরা ঋণ দেয়ার সময়েই জমি বিক্রির দলিল করাইয়া লয়। গরীব ও ভূমিহীন কৃষকের পক্ষে প্রতি বৎসরই ঋণের জন্য মহাজন ও জোতদারদের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া বর্তমানে আর কোন উপায় থাকে না। কারণ, তাহারা সরকারী ঋণ হইতে বঞ্চিত। ঋণের দায়ে মধ্য কৃষক গরীব কৃষকে পরিণত হইতেছে, আর গরীব কৃষক ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হইতেছে। শতকরা ৮০ জন কৃষকের প্রধান সমস্যাই হইল—'জমির সমস্যা'।

বর্তমান সরকারের ভূমি সংস্কার নীতি

দেশ স্বাধীন হইয়াছে। স্বাভাবিক ভাবেই কৃষক আশা করে যে বর্তমান সরকার দ্বারা তাহাদের মূল সমস্যা—জমির সমস্যার কিছুটা সমাধান হইবে। অন্যদিকে ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তনের আশঙ্কা জোতদারশ্রেণীও করিতেছিল।

স্বাধীনতার কয়েকমাস পরই বর্তমান সরকার তাহাদের ভূমি নীতি ঘোষণা করেন। বর্তমান সরকার পুনরায় জমির সর্ব্বোচ্চ সীমা পরিবার প্রতি ১০০ বিঘা ধার্য্য করার নীতি গ্রহণ করেন এবং উদ্বৃত্ত জমি ও সরকারী খাস জমি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে বিলিবণ্টন করার নীতি ঘোষণা করেন। কিন্তু, উক্ত নীতি এখনও কার্য্যকরী হয় নাই।

সরকারের ভূমি সংক্রান্ত নীতি ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ব হইতেই জোতদাররা পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির

নামে জমি ভাগ করিয়া পৃথক পৃথক পরিবার হিসাব দেখাইয়া প্রায় সকল জমি নিজেদের হাতে রাখিয়া দেওয়ার কৌশল গ্রহণ করে। কিন্তু, সরকার ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ করেন এবং পরিবারের যে সংজ্ঞা দেন, তাহাতে জোতদার শ্রেণীর উক্ত কৌশল বানচাল হওয়ার উপক্রম হয়, ।

তাই, উত্তরবঙ্গের জোতদারশ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হয়, সভা করে এবং সরকারের ভূমি সংস্কারের নীতি পরিবর্তন করার দাবী করে, জোতদারশ্রেণীর চাপে সরকার পরিবারের সংজ্ঞা পরিবর্তন করেন এবং ভূমি সংস্কার নীতি কার্যকরী করিতেও বিলম্ব করেন।

পরিবারের সংজ্ঞা পরিবর্তন করা এবং ভূমি সংস্কার নীতি কার্যকরী করার ক্ষেত্রে বিলম্ব করার ফলে জোতদারশ্রেণী তাহাদের পরিবারকে কয়েক পরিবারের ভাগ করিয়া অতি সহজেই বর্তমানে প্রচুর জমি নিজেদের হাতে রাখিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

জোতদারশ্রেণীর চাপের নিকট নতি স্বীকার করিয়া পরিবারের সংজ্ঞা পরিবর্তন করার ফলে গরীব ও ভূমিহীন কৃষককে জমি দেওয়ার যে সরকারী নীতি তাহা আজ অনেকখানি ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে।

অতএব, পরিবারের পূর্ব সংজ্ঞা অনুযায়ী ভূমি সংস্কার নীতি অবিলম্বে কার্যকরী না হইলে অথবা পরিবারের লোক সংখ্যানুপাতে জমি সিলিং ধার্যের নীতি গৃহীত না হইলে কৃষকের জমি সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে না।

তাছাড়া, সরকার বর্তমানে ভূমি সংস্কারের যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে বর্গা প্রথা সংস্কারের কোন ব্যবস্থা নাই।

বর্তমানে আমাদের দেশে বর্গা প্রথাই হইল—সামন্তবাদী ব্যবস্থার অবশেষ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক শোষণ ব্যবস্থা।

তাছাড়া, রংজমা বা অগ্রিম টাকা নিয়া জমি এক বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রথা ও বিদ্যমান রহিয়াছে।

দেশের পরিবর্তিত অবস্থান ভূমি সংস্কারের আশঙ্কা করিয়া জোতদারশ্রেণী বর্গা জমি হইতে বর্গা চাষীদের উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই উচ্ছেদ বন্ধ করার জন্য সরকার হইতে কোন ব্যবস্থা আজও হয় নাই।

বর্গা প্রথার মাত্রাহীন শোষণ হইতে গরীব বর্গাচাষীকে কিছুটা রেহাই দেওয়ার জন্য বর্গা প্রথার কিছুটা সংস্কার সাধন করা একান্ত জরুরী ছিল। অন্ততঃপক্ষে বর্গা জমি হইতে বর্গা চাষীকে উচ্ছেদ করার যে ব্যবস্থা হইতেছে তাহা রোধ করার জন্য অবিলম্বে সরকার হইতে জরুরী ব্যবস্থা (অর্ডিন্যান্স) গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দেশের ভূমি ব্যবস্থা এখনও প্রধানতঃ সামন্ততান্ত্রিক। ধনবাদী ব্যবস্থা অনুযায়ী বড় বড় কৃষি খামার আমাদের দেশে এখনও গড়িয়া উঠে নাই। কৃষিক্ষেত্রে ধনবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা কিছু কিছু চালু হইলেও উহা নগন্য।

কৃষিক্ষেত্রে আমাদের উৎপাদনের উদাহরণও মান্ধাতা আমলের। একদিকে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা এবং অন্যদিকে মান্ধাতা। আমলের কৃষি উৎপাদনের উপকরণ উভয়ই আমাদের দেশের কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিদারুণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতেছে।

সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়া খোদ কৃষকের জমি দেওয়ার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত এবং যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি উৎপাদনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কৃষি ও কৃষক সমাজের তথা সমগ্র জাতির উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা হইতে পারে না।

যেহেতু জোতদারশ্রেণী বিনা পুঁজিতে এবং বিনা পরিশ্রমেই ঘরে বসিয়া উৎপাদিত ফসলের অর্দ্ধেক পাইয়া যায়, সেই হেতু জমির উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধির জন্য জমির মালিক জোতদারদের কোন আগ্রহ বা প্রচেষ্টা থাকিতে পারে না, অন্যদিকে যেহেতু বর্গা চাষী জমির মালিক নয়, সেইহেতু বর্গাচাষীরও জমির উন্নয়ণের জন্য বিশেষ কোন আগ্রহ থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা তথা বর্গা প্রথার অবসান না হওয়া পর্যন্ত ব্যাপক ভাবে যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করাও সম্ভব নয়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষাবাদ চালু করার জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে যৌথ চাষ বা যৌথ কৃষি খামার গড়িয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন! এজন্য খোদ কৃষকের হাতে জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরী।

তৃতীয়তঃ বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় ২৮ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি। এই খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য আজ আমাদিগকে আমেরিকার দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। ইহারই সুযোগে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করিতেছে। তাই, অতি দ্রুত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা আমাদের দেশের সামগ্রিক স্বার্থে একান্ত জরুরী।

চতুর্থতঃ আমাদের দেশের শিল্প উন্নয়ণ ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ও সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করা এবং খোদ কৃষকের হাতে জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরী। কারণ, আমাদের দেশের জন সংখ্যার শতকরা ৮৫ জনই কৃষক। তাই, কৃষকের অবস্থার উন্নতি বিধান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ছাড়া শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

ভূমি সংস্কারের বাস্তবায়ন

কেবল কৃষক সমাজের স্বার্থেই নয়, সমগ্র দেশের ও জাতির বিকাশ ও উন্নয়নের স্বার্থেই আজ সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করা এবং খোদ কৃষকেয় হাতে জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

তবে, সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিতে হইলে বর্তমান অবস্থায় উহা পর্যায়ক্রমেই করিতে হইবে। ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক জোতদারশ্রেণীই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা বাধাদান করিবে। অতএব, ভূমি সংস্কারকে প্রাথমিকভাবে কার্যকরী করিতে হইলেও জোতদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে।

ভূমি সংস্কারের জন্য কৃষক সমাজ যতবেশী সচেতন হইবে এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করিতে সমর্থ হইবে এবং ভূমি সংস্কারের সপক্ষে অন্যান্য শ্রেণীকেও যতবেশী জমায়েত করা সম্ভব হইবে, ততটা পরিমাণেই ভূমি সংস্কার কার্যকরী করা বা ভূমি সংস্কারের নীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হইবে।

ভূমি সংস্কায় বাস্তবায়নের সংগ্রাম একটি শ্রেণী সংগ্রাম। এই সংগ্রামে জোতদারশ্রেণীর বাধাদানকে প্রতিহত করার জন্য কৃষক সমাজের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সাথে সাথে ভূমি সংস্কারের সপক্ষে জাতীয় ঐক্যও গড়িয়া তোলা প্রয়োজন।

বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে সরকার যে ভূমি নীতি গ্রহণ করিয়াছেন উহাকে কৃষকের স্বার্থেও জাতীয় স্বার্থে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে উহার কিছুটা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। উক্ত নীতিকে সঠিকভাবে কৃষকের স্বার্থে বাস্তবায়িত করিতে হইলে ভূমি সংস্কারের সপক্ষে শক্তিশালী জনমত গঠন করা প্রয়োজন। উহা না করা পর্যন্ত জোতদারশ্রেণীর বিরোধীতাকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়।

বর্তমানে এমনভাবে জমির সিলিং ও পরিবারের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করা দরকার, যাহাতে গরীব ও ভূমিহীন কৃষক জমি পাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ভূমিহীন কৃষকদিগকে যে জমি দেওয়া হইবে, সেই জমি যাহাতে যৌথভাবে যতটা সম্ভব যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ হইতে পারে, তারজন্য প্রথম হইতেই কো-অপরেটিভ গঠনের উদ্যোগ সরকার হইতে নেওয়া দরকার এবং সরকার হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি সরবরাহ ও সাহায্যের ব্যবস্থা করা দরকার।

তৃতীয়তঃ সরকার হইতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে এবং কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া উহা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিও গ্রহণ করা প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হইলে জমির সিলিং পর্যায়ক্রমিক কমাইয়া আনা এবং সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অবসান করার দিকে অগ্রসর হওয়াও সম্ভব হইবে।

ভূমি সংস্কার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইল কৃষক সমাজ, বিশেষ করিয়া গরীব ও ভূমিহীন কৃষকের সচেতনতা, সংগঠন শক্তি ও উদ্যোগ। কেবল মাত্র আইনের মাধ্যমে ভূমি সংস্কারের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন কিছুতেই সম্ভব নয়।

যেহেতু পশ্চাৎপদ সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থার উচ্ছেদের পর্য্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া কিছুতেই দেশের সামগ্রিক উন্নয়ণ বা দেশের অগ্রগতির পথে প্রাথমিক পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভবপর নয়, সেইহেতু ভূমি সংস্কার সঠিকভাবে বাস্তাবায়ণের জন্যই সরকার ও দেশবাসীর পক্ষ হইতে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

—আব্দুস সালাম

সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং ভাষা

স্বাধীনতা এসেছে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। এ বিপ্লব রাজনৈতিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক। এই বিপ্লবটি যেন একটি তিন অংকের নাটক, যার মধ্যাংকে রয়েছি আমরা এই মুহূর্তে।

এ বিপ্লবের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক রূপান্তরের উপকরণ বিস্ফোরকের মতো মিশ্রিত রয়েছে। তাছাড়া এই উপকরণগুলি আনুপাতিকভাবে সুষম করে সাজানো নেই। জীবনের প্রবাহে উপকরণ সমূহের সুষম সজ্জা আসে নাটকের মতোই তৃতীয় অংক। আমাদের অবস্থাটাও অনেকটা সেরকম। তবে স্বাধীনতার পরে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অবস্থান ও গতিধারা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা রাজনৈতিক মুক্তির পথের বাধাগুলিকে অপসারিত করার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিকাশ ও সমৃদ্ধির বাধাগুলিকে অনেকাংশে অপসারিত করে দেওয়ার ফলে সংস্কৃতি আমাদের জীবনে কল্লোলিত হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। আমাদের রাজনীতিকে অর্থপূর্ণ এবং আমাদের অর্থনীতিকে ফলপ্রসূ করার কর্মকাণ্ডে এই কল্লোলিত সংস্কৃতি একটা পরিচালিকা শক্তিরূপে কাজ করবে।

'৫২ সালের রক্তাক্ত ফেব্রুয়ারী বাংলাভাষা আন্দোলন সূচনা করেছিল রাজনৈতিক বিপ্লবের তাগিদের। সূচনা হয়েছিল সাংস্কৃতিক বিপ্লবেরও তাগিদের। এই বিপ্লবের মতেই এসেছিল সামাজিক অর্থনৈতিক বিপ্লবেরও তাগিদ। '৫২ থেকে '৭১ পর্যন্ত এই ত্রিবিধ তাগিদের মধ্যে কখনও কোন একটা তাগিদ প্রবলতর হয়েছিল, কখনো বা কোন আরেকটা প্রবলতর হয়েছেল। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তাগিদ বিশেষ করে মাতৃভাষার ব্যাপকতম

উপকরণকে ভিত্তিকরে বরাবরই প্রবল ছিল। তবে আমাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো ছিল উপনিবেশিক শাসন ও শোষনের জিঞ্জীরে আবদ্ধ। আমাদের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তাগিদ তাই কখনও কখনও অবদমিত ছিল।

উপনিবেশিক কাঠামোকে ভেঙ্গে ফেলে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রকাশ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তাগিদকে পরিপুর্ণ মুক্তির দিকে এগিয়ে দিয়েছে। যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি আমাদের অন্যতম লক্ষ হিসাবে নির্ণীত সমাজতন্ত্রে সম্ভাব্য, তা একে সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করবে। সুতরাং স্বাধীনতার পরে সাংস্কৃতিক বিপ্লব তিন দিক দিয়েই উৎসাহিত হচ্ছে বলা যেতে পারে। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিপ্লবের কাছ থেকে উপকরণ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি নিজেও বৈপ্লবিক উপকরণ তৈরী করে নিতে যাচ্ছে। এই অবস্থায় আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন পেঁাচেছে।

এই পটভূমিতে সাংস্কৃতিক বিপ্লব একটা সামগ্রিক বিন্যাস পেতে যাচ্ছে।

আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক প্রয়াস স্বাধীনতার আগে বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরে উদ্বেলিত হচ্ছিল পৃথক পৃথক খাতে। সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও তাই আলাদা আলাদা খাতে আলাদা আলাদা ভাবে বয়ে চলেছিল। মুক্তি সংগ্রামী দেশবাসীর বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণী উপনিবেশিক শৃঙখলা ছিন্নকরার সংগ্রামে নিয়োজিত থাকার সময় মুক্তির ছবি ও সুরকে সংস্কৃতির নিজ নিজ খাতে অভিব্যক্ত করার ব্যবস্থা করেছিল। বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মেহনতীরা সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রভৃতির বিপ্লবী উপকরণকে নিজ নিজ ধারা অনুযায়ী সাজিয়ে নিয়েছিল। তবে মিলন সেতুও ছিল। মিলন-সেতু ছিল স্বাধীনতার চিন্তা, ছাত্রসমাজ এবং মাতৃভাষা বাংলা। এরা ধরে রেখেছিল বলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব তার একটা সামগ্রিক তাগিদ রেখেছিল রাজনৈতিক এবং সামাজিক অর্থনৈতিক মুক্তির তাগিদে।

স্বাধীনতার পরে সামগ্রিক বিন্যাসের তাগিদ আসার দরুণ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের একটা কাজ পৃথক পৃথক সংস্কৃতির খাতগুলিকে একটি ধারায় পরিণত করা এবং সারা দেশের সমগ্র মুক্তিকামী জনগণকে সমাজতন্ত্র-মুখী করে নেয়া।

সমাজতন্ত্র হচ্ছে এমন একটি প্রযুক্তি ও প্রকল্প সম্পন্ন কর্মকাণ্ড যার বিকাশের তাগিদে শ্রমিক শ্রেণীর সমস্ত স্তর একত্রিত হবে এবং শ্রমিক শ্রেণী ভারসাম্য ঠিক রেখে কাজ করতে পারলে কৃষক এবং বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত ও বিভিন্ন ধরনের মেহনতী মানুষ এবং ছাত্র সমাজ শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে একত্রিত হয়ে সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বিপ্লবে শরিক হবে।

এক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র ও সংস্কৃতির প্রানবন্ত সম্পর্কটিকে সঠিক ভাবে বুঝতে পারার উপরেই অবশ্য নির্ভর করছে, সংস্কৃতির উপকরণকে এবং সাংস্কৃতিক সাধনাকে সামান্য মাত্র ও অপচয় না করে আমরা সাবালীল ভাবে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারবো কি পারবোনা।

এখানে ভাষার প্রশ্নটিকেই যাচাই করে দেখা যাক। ভাষা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সবচেয়ে বড় মাধ্যম এবং উপকরণ। সাজ সজ্জা, ছবি এবং সুর প্রভৃতি অন্যান্য মাধ্যম ও উপকরণগুলিকে জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করা যত দু:সাধ্য সেই তুলনায় ভাষার মাধ্যম অনেক বেশী সহজ সাধ্য। এখনও কথা বলতে হবে বেশি। গানের মধ্যেও ব্যাখ্যা দিতে হবে বেশী। আমাদের জনসাধারণ সৌন্দর্য নিয়ে আলাপ করবেন বেশী, মুখর হবেন বেশী। নাটকে বেশী কথা থাকবে বলেই ছড়ানো হবে। স্থুলতাকে এড়ানো যাবেনা। কবিতা মুক্তার মতো নিটোল হবে না সবসময়।

আমাদের গানে কাজের কথা থাকবে বেশী। কবিকঙ্কনের কবিতায় ধানের নামের চেয়েও বেশী দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক উপকরণের নাম থাকতে পারে হয়তো আমাদের গানে, গল্প, কবিতায়, উপন্যাসে। এর কারণ এই যে, আমাদের সাংস্কৃতিক বিপ্লব বাঙময় করে তুলবে আমাদের জনগণকে, যারা এতকাল ধরে নিপীড়িত ছিল, মনের স্থুল ও সূক্ষ্ম আকাঙখাগুলিকে প্রাণভরে খুলে বলতে পারেনি।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুধু জনগণকে বাঙময়ই করবেনা, সুষমভাবে বাঙময় করবে।

—রণেশ দাশ গুপ্ত

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পটভূমি

সাম্প্রতিক বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর বিশ্লেষণের পূর্বশর্ত হিসেবে আমাদের সজ্ঞান থাকতে হবে দুটো দিক দিয়ে। প্রথমতঃ আমাদের বর্তমান অর্থনীতি বিচারের তুলাদণ্ড কি হবে—প্রাক স্বাধীনতা ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ এর অর্থনৈতিক ক্রম বিকাশের ধারা ও উন্নয়নের সূচক গুলো,—না, আরো আগের, পূর্ববর্তী বৃটিশ শাসন বা মোগল শাসন আমলের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা? দ্বিতীয় প্রেক্ষাপট হচ্ছে বাংলাদেশে মূল অর্থনৈতিক চরিত্র কি? মূল অর্থনৈতিক চরিত্র বলতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে বিশেষ ধারাটি নির্বিশেষে মার্ক্সবাদী ও অমার্কসবাদীরা মেনেনিয়েছেন যে ঐতিহাসিকভাকে সমাজ বিকাশের ধারায় কতগুলো ধাপ রয়েছে যেমন আদিম শ্রেণীহীন সমাজ, দাস প্রথার যুগ, সামন্ততান্ত্রিক যুগ ও ধনতান্ত্রিক যুগ। এই পাঁচটি ধাপের মধ্যে বাংলাদেশের মৌলিক অবস্থান কোন্ স্তরে সবচেয়ে সুনির্দিষ্টভাবে অবস্থান করছে।

প্রথম অনুসিদ্ধান্তের জবাব তৈরী করতে গিয়ে খুব সহজেই যে প্রশ্নটা এসে যায় তা হচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলন কোন্ পটভূমিতে চূড়ান্ত রূপলাভ করে? স্বভাবতই আরো কিছু প্রশ্ন এসে যায় বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ কবে হয় এবং কোন্ সমাজে হয়? যে কোন সমাজবিজ্ঞানী একথা স্বীকার করবেন যে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত যে পাকিস্তানী শাসন কাল চলে পাকিস্তানে তখনই বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করে। তবে একথাও ভুলে গেলে চলবে না যে বৃটিশ শাসন আমলে সামগ্রীকভাবে ভারতে জাতীয়তাবাদের মৌল আকর

নির্মানের পথে যে আন্দোলনগুলো সহায়ক হয়েছিল তা বাংলাদেশ থেকেই উদ্ভূত। সরাসরি যে কারণগুলো সচারচর তার পেছনে রয়েছে বলে ধারনা করা হয় তা হলো: কোলকাতায় রাজধানী, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরন, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে বুদ্ধিবিপ্লব বাংলাদেশে হয় এবং বাংলাদেশের পৃথক অর্থনীতি। এই সবগুলো প্রশ্নই পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারতো, তা হয়নি, তার কারণ ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হলেও বিক্ষুব্ধ বাংলার মূল সমস্যাগুলো পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আরো সুসংস্থিত হয়েছে। এবং বিরাট ভৌগলিক দূরুত্বে দ্বারা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদী শোষণ আরো স্পষ্টতর হয়েছে। দ্বিতীয়ত ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পর্যন্ত যতবারই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি বাংলাদেশে স্বাতন্ত্র ও জাতীয় নেতৃত্ব অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করছে ততবারই তা আরো ব্যাপকতর ভাবে কেলাশিত হয়েছে। ফলে প্রথম অনুসিদ্ধান্তের জবাবে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি বর্তমানে বাংলার যে কোন অর্থনৈতিক কল্যাণচিন্তার পটভূমি হচ্ছে সাম্প্রতিক ইতিহাসের "পাকিস্তানী শাসন" এবং এই পাকিস্তানী শাসনের শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে বাংলাদেশের জন্ম। এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য ১৯৭০ এর নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক প্রচার কার্যে একটি পরিসংখ্যান সম্বলিত প্রচার পত্র প্রচার করা হয়। তাতে নির্দ্দেশ করা হয়েছিল বাংলাদেশে ও পাকিস্তানের মধ্যেকার আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা এবং তার উপরে লেখা ছিল "সোনার বাংলা শ্মশান কেন?" এই আঞ্চলিক বৈষম্যের মধ্যেদিয়ে সকল রাজনৈনিক বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছিল এবং বস্তুত জাতীয় স্বাতন্ত্র ও বিদ্রোহের ইঙ্গিত ও ছিল। কাজে কাজেই বাংলাদেশের উপর বিদেশী শাসনের ফলে বাংলাদেশের যে অবস্থা তা দিয়েই শুরু হয়েছিল আমাদের বিপ্লবের সূচনা। এবং সে দারিদ্র্যাবস্থা মোচনার্থেই এই স্বাধীনতা যুদ্ধ—এই আত্মাহুতি। ফলে ভবিষ্যতের যে কোন প্রেক্ষাপট থেকেই তুলনার মানদণ্ড হিসেবে সে প্রাথমিক অবস্থাটিই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে আমরা কতদূর অগ্রসর হলাম।

আমাদের বিচার্য দ্বিতীয় অনুসিদ্ধান্তটি হচ্ছে বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক চরিত্র কি? প্রথম অনুসিদ্ধান্ত থেকেই আমরা আরো বিস্তারিত প্রেক্ষাপটে গিয়ে দেখি বাংলাদেশের মূল চরিত্র এক কথায় ঔপনিবেশিক

অর্থনীতি। তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় দেখা যায় ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে একটি উন্নত ও বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ সম্বলিত দেশই একটি অবৈজ্ঞানিক ও অনুন্নত দেশকে শোষণ করে আসছে। অনুন্নত বাংলাদেশের অর্থনীতির চেহারাও যে কোন দেশের যে কোন অর্থনৈতিক সূচকের তুলাদণ্ডে ধরা পড়বে – সে মাথাপিছু আয়ই ধরা হোক, কিম্বা জাতীয় আয়ই ধরা হোক। রেনেসাঁ ও শিল্পবিপ্লবের মধ্যেদিয়ে যে ধনতান্ত্রিক সমাজ ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয় তার উদ্বৃত্ত উৎপাদন নিয়েই বৃটিশ ভেনিশ, ফরাসী. পোর্তুগীজরা ভারতে তথা বাংলাদেশের স্বাধীন অর্থনীতি উপনিবেশিক যাঁতাকলে পড়ে যায়। বাংলাদেশের সার্বভৌম অর্থনীতি তখন থেকেই বিকৃতি লাভ করে। ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত ১৬৫১ সালে প্রথম ইংরেজরা দলবেঁধে বাণিজ্যের জন্যে বাংলায় পদার্পন করে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে তার আগে বাংলার মাটিতে মোগল-পাঠানদের পদার্পন হয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়েছে যে ইংরেজদের আগে যারাই বাংলাদেশ আক্রমন করেছে বা শাসন করেছে কারো সংস্কৃতিই ভারতের তথা বাংলার সাংস্কৃতির চেয়ে উন্নত ছিল না। ফলে বাংলার সাংস্কৃতিকও অর্থনৈতিক চরিত্রে বিশেষ কোন রদবদল মোগল-পাঠান আমলে হয়নি। বাংলাদেশের স্বতন্ত্র চরিত্রের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে যে মুসলীম বিজেতারা পরাজিত প্রত্যেকটি দেশের ভাষা পরিবর্তন করে দিয়েছে কিন্তু বাংলায় তা হয়নি। কাজে কাজেই ইংরেজরাই ধনতান্ত্রিক আদর্শ, রেনেসাঁ ও শিল্প বিপবের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ নিয়ে এ দেশের মূল চরিত্রে আঘাত হানলো। তবেই আমরা ধরে নিতে পারি প্রাক-ইংরেজ বাংলার ঐতিহাসিকধারায় যে অর্থনীতি সাবলীলভাবে গড়ে উঠেছিল তাই বাংলার অর্থনীতি এবং সে সঙ্গে এও বিচার করা সম্ভবপর হবে ইংরেজ ও তৎপরবীত কালে পাকিস্তানী শাসন আমলে কি কি বিবর্তন অর্থনীতিতে সাধিত হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির একটা আনুসঙ্গিক ফল হচ্ছে এই যে সাম্রাজ্যবাদী দেশ উপনিবেশকে শোষণ করতে গিয়ে উপনিবেশকেও কাঠামোগতভাবে উন্নত অর্থনীতির দিকে চালিত করে দেয়। এ যুক্তির পাশে একটি উদাহরণ ন্যায় সঙ্গতঃ ইংরেজরা মূলত কাঁচামাল সংগ্রহের জন্যেই রেলপথ বসিয়েছিল ভারতে কিন্তু এই রেলপথই ভারতে ও বাংলায় ধনতন্ত্রের বিকাশ ডেকে আনে এবং বাংলার মূল

অর্থনৈতিক চরিত্রকে পালটিয়ে দেয়। অন্যদিকে বাংলার সার্বভৌম কুটির শিল্পের মূলউৎপাটন করে ফেলে ইংরেজ বেনিয়ারা।

তাহলে প্রাক-ইংরেজ বাংলার অর্থনীতিই যদি শেষ সার্বভৌম অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট-তা হলে সেখান থেকেই আমরা বিচার শুরু করতে করতে পারি তৎপরবর্তি অর্থনৈতিক বিকাশগুলো কতদূর এগিয়ে নিয়ে গেছে বাংলাদেশকে। এবং বর্তমানে বাংলাদেশ শত শত বছর পর তার মূল অর্থনীতি থেকে কতদূর উন্নত।

যে প্রশ্নের জবাব নিয়ে একটি বিরাট বিতর্কের অবতারনা হয়েছে, প্রশ্নটি হলো ভারতের মৌলিক সামাজিক বৈশিষ্ট কি? কিম্বা আরো ব্যাপকতরভাবে "এশীয় সমাজব্যবস্থা।" কি? প্রশ্নের মূল দিক নির্দেশ আমি আগেই দিয়েছি যে রেনেসাঁ শিল্পবিপ্লব উদ্ভূত ইউরোপীয় সমাজের আধিপত্য সাম্রাজ্যবাদী রূপে এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু প্রাক-সামন্ততান্ত্রিক বা নিম্ন-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ পর্যন্ত এশীয়, বিশেষত ভারত ও চীন ইউরোপীয় সংস্কৃতির চেয়ে কোন অংশ কম ছিল না।

আমাদের প্রশ্ন ভারত তথা বাংলাদেশ উপনিবেশ না হয়ে সাম্রাজ্যবাদী কিম্বা ইউরোপের মত অন্যান্য সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিকাশ লাভ করতে পারলো না কেন?

এ প্রশ্নের জবাব ও পাওয়া যাবে প্রাক-উপনিবেশিক বাংলার অর্থনীতিতে। এই অর্থনীতির সবচেয়ে নির্ভুল চেহারা পাওয়া যায় মার্কেসের লেখায়।

ভারতীয় অতীতের রাজনৈতিক চেহারাটা যতই পরিবর্তনশীল বলে মনে হোক না কেন, সুদূর পুরাকাল থেকে উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত তার সামাজিক অবস্থা অপরিবর্তিত থেকেছে। সে সমাজ-কাঠামোর খুঁটি হল হস্তচালিত তাঁত আর চরকা, যা থেকে তাঁতী তার সুতাকাটুনির খাঁটি অক্ষৌহিনীর সৃষ্টি।

এশিয়ায় অবিস্মরণীয় কাল থেকে সরকারের সাধারণত শুধু তিনটি বিভাগ বর্তমান ছিল; কোষাগারবারাজস্ব অর্থাৎ অভ্যন্তর লুণ্ঠন বিভাগ, যুদ্ধ অর্থাৎ বহির্দেশ লুণ্ঠন বিভাগ এবং পরিশেষে পাবলিক ওয়ার্কসের বিভাগ। .... খাল ও জলাশয় দিয়ে কৃত্রিম সেচ ছিল প্রাচ্য কৃষির ভিত্তি।

মাকর্সের এ রচনাটিতে একটি ঐতিহাসিক দলিলের সন্নিবেশ দেখতে পাই; ১৮১২ সালে বৃটিশ কমন্‌স সভার একটি রিপোর্ট।

"ভৌগোলিকভাবে দেখলে একটি গ্রাম হলো কয়েক শত বা কয়েক হাজার একর আবাদী বা পতিত জমির এক একটি অঞ্চল, রাজনৈতিকভাবে দেখলে তার ধরনটা কর্পোরেশন বা পৌরগোষ্ঠীর মতো। তার পরিচালক ও সেবকদের ব্যবস্থাপনা নিম্নোক্ত ধরণের; পটেল অথবা প্রধান মণ্ডল, তার উপর সাধারণ গ্রামের অবস্থা-ব্যবস্থার তদারক করার ভার, অধিবাসীদের মধ্যেকার ঝগড়ার সে মীমাংসা করে, পুলিসের কাজ দেখে, এবং স্বগ্রামের অভ্যান্তর থেকে কর-সংগ্রহের কাজ চালায়—ব্যক্তিগত প্রভাব এবং গ্রামবাসীদের অবস্থা ও স্বার্থের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে এ দায়িত্বের পক্ষে সে হয় সবচেয়ে উপযোগী। কার্ণম চাষের হিসাব রাখে এবং চায সংক্রান্ত সব কিছু নথিবদ্ধ করে। তৈলার আর তোতী—প্রথম জনের কাজ অপরাধাধির সংবাদ সংগ্রহ এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তর গমনাগমনে লোকজনকে পৌঁছে দেওয়া ও রক্ষা করা, অপর জনের এখতিয়ার গ্রামেই সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়, অন্যান্য কাজ ছাড়াও তার কাজ হল শস্য পাহারা দেওয়া এবং তার পরিমাপে সাহায্য করা। সীমানাদার—তার কাজ গ্রামের সীমানারক্ষা এবং কলহ উপস্থিত হলে সীমানা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া। জলাশয় ও জলপ্রনালীর তত্ত্বাবধায়ক কৃষির জন্য জলের বিলি ব্যবস্থা করে। ব্রাহ্মণ করে গ্রামের পূজ-অর্চনা—গুরু মশায়কে দেখা যায় গ্রামের ছেলেপিলেদের বালির উপর লিখতে পড়তে শেখাচ্ছেন।... এই সরল ধরনের পৌর শাসনের আওতায় অবিস্মরণীয় কাল থেকে এ দেশবাসী বাস করে আসছে।... রাজ্যের ভাঙাভাঙি ভাগবিভাগ নিয়ে অধিবাসীরা মাথাঘামায় না, গ্রামটি অখণ্ড থাকলেই হল, কোন্ শক্তির কাছে তা গেল কোন্ সম্রাটের তা করায়ত্ত হল এ নিয়ে তারা ভাবে না।

(উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে : মার্কস-এঙ্গেলস, মস্কো)

১৭৫৭ সালের যুদ্ধে বাংলার জনগণের প্রতিক্রিয়া প্রমান করে শেষ লাইন কয়েকটির সত্যতার কথা। রিপোর্ট ১৮১২সালে প্রবর্তিত তখন পর্যন্ত এই কর্পোরেশন সার্বভৌম গ্রামীন অর্থনীতি প্রচলিত ছিল বলা যায়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের থেকে বাংলার অর্থনৈতিক চরিত্রের সঙ্গেই উপরের উদ্ধৃতিগুলির সাযুজ্য বেশী এবং এ কারনেই

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেয়া হলো। আজো বাংলার গ্রামে এই প্রচ্ছন্ন "অর্থনৈতিক নৈরাজের" সন্ধান পেয়ে চমক উঠি, এই স্থবির সমাজের বিকাশ কোন্ পথে সম্ভব! এই নৈরাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা বাংলার সম্পদকে লুণ্ঠন করেছে কিন্তু মহাত্মা গান্ধী আহুত অসহযোগ আন্দোলনের পেছনে এই অর্থনৈতিক নৈরাজ্যের ভিত্তীই ছিল – "স্বয়ং সম্পুর্ণ গ্রাম।" এই নৈরাজ্যই বাংলার অর্থনীতির মূল, যেখানে সার্বভৌম স্বায়ত্বশাসিত অর্থনীতির চূড়ান্ত পরিনতি। তৎকালীন বাংলার একটা চমৎকার ছবি পাওয়া যায় মিঃ হওয়েলের বর্ণনায়: "এখানে জনগণের স্বধীনতা ও সম্পদের উপর কেউ হস্তক্ষপ করে না। পণ্যব্যবসায়ী কিম্বা পণ্যহীন পর্যটক দেশে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের তত্বাবধনে চলে আসে – যারা তার সব রকমের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন বিনা খরচে।... যদি একটা অর্থের পুটুলি কিম্বা মূল্যবান দ্রব্য কেউ হারিয়ে ফেলেন তা হলে যে ব্যক্তি প্রথম এটি পেয়ে যায় সে তৎক্ষণাৎ প্রহরীকে এ ব্যাপারে অবহিত করেন.... ।"

এ পর্যায়কে চূড়ান্ত বলার অন্যতম কারন পাওয়া যায় মিঃ হওয়েলের দ্বিতীয় মন্তব্যে, "উন্নত ঢাকা প্রদেশটি সম্পুর্ণভাবে আবাদী ছিল .... ।" এবং একটি বিশেষ কৃষি পদ্ধতিতে চাষাবাদ চূড়ান্ত ভৌগলিক সীমায় পেঁাছে যাওয়া মানে সে পদ্ধতির চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যাওয়া, যদি আবাদের কৌশল পরিবর্তন না করা হয়। এই চূড়ান্ত পর্যায়েই লর্ড ক্লাইভ সাহেব বাংলাদেশেকে দেখে মন্তব্য করেছিলেন—স্বর্গরাজ্য (গার্ডেন অব ইডেন)।

উপরের তথ্যগুলো লাজপত্ রায়ের "ইংল্যাণ্ডস্ ডেট টু ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে। এবং তারপরই এই স্বর্গরাজ্যকে শোষণ করা শুরু করলো ইংরেজরা গভর্ণর হ্যারি ভেরেল্ষ্ট-এর খতিয়ান থেকে; "তার হিসেব মত ১৭৬৬, '৬৭ ও '৬৮ সালের বাংলার রপ্তানী হয়েছে ৬,৩১১,২৫০ পাউণ্ড এবং বিদেশ থেকে আমদানী হয়েছে ৬২৪,৩৭৫। পাউণ্ড। তার মানে যা রপ্তানী করেছে তার দশভাগের একভাগ আমদানী করেছে।"

শোষনের দ্বিতীয় হাতিয়ার হলো কর-খাজনা। "১৭৯০-৯১ সালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা থেকে জমির খাজনা (Land Revenue) সংগ্রহ করা হয় ২৬,৮০০,৯৮৯ টাকা অথবা ২,৬৮০,০০০ পাউণ্ড। এ সংখ্যাটি শতাবদীর প্রথম দিকে জাফর খান ও সুজা খান যে কর

নির্ধারন করেছিলেন তার দ্বিগুণ, মহারাজ নন্দকমারের সংগ্রহের তিন গুণ, যা তোলা হয়েছিল মীরজাফরের শাসনামলের শেষ বছরগুলোতে ১৭৬৪-৬৫ সালে। কোম্পানীর তত্ত্বাধানে মোহাম্মদ রেজা খান ১৭৬৫-৬৬ সালগুলোতে যে কর সংগ্রহ করেছিল তারও দ্বিগুন এই ৯০-৯১ এর সংগ্রহ।

[রমেশ দত্ত : ইকনমিক হিস্ট্রী অব ইণ্ডিয়া, প্রথমখণ্ড]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলা সার্বভৌম গ্রামীন অর্থনীতিকে আঘাত হানা হলো। পুরানো চরিত্রের প্রশাসনীক দিকে কিছু রদবদল হলে ও বস্তুত গ্রামের সামাজিক বন্ধন ও বিন্যাস একই রয়ে গেল। কিন্তু আঘাতটা প্রচ্ছন্নভাবে আঘাত করলো আস্তে আস্তে – কর্পোরেশনগুলো ভেঙ্গেগিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলো।

বৃটিশ শাসনকে অতি সরলভাবে ভারতীয় অর্থনীতির উপর ত্রিমাত্রীক আক্রমন বলাচলে। প্রথমতঃ, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ, দ্বিতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বলপূর্বক অনুপ্রবেশ এবং তৃতীয়তঃ জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও আমলাতান্ত্রিক (মিলিটারী এরিষ্ট্রোক্রাসী) শাসন ব্যবস্থার বিকাশ। এই তিনটি প্রেক্ষিত থেকেই স্বাভাবিকভাবে সমাজে একটি বিরাট "বিচ্ছিন্নতা" গড়ে উঠলো। বিচ্ছিন্নতা বলতে সর্বের ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিচ্ছিন্নতা এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন ও সাম্রাজ্যবাদীর সাথে উপনিবেশের বিচিছন্নতা এসে যায়।

বাংলাদেশের একজন ব্যক্তির চৈতন্যে এই তিনটি বিশেষ চরিত্রের বিকাশ লাভ করলো বিচিছন্নতার মধ্যে – তারা দেশের সার্বভৌম স্বায়ত্ব-শাসীত অর্থনীতি ভেঙ্গে দিয়ে আনলো ধনতান্ত্রিক শিল্প, রেলপথ, বৃটেনে উৎপাদিত দ্রব্য জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হলো। অন্যদিকে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ফলে সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক হলো "বিরুদ্ধতার"। জনগণ তিনটি ভিন্নতর দৃষ্টিকোন থেকে অকস্যাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। এবং শোষণের হাতিয়ার যতই দিন দিন শক্ত হতে থাকলো বিছিন্নতাও বাড়তে লাগলো একই ভাবে।

ভারতের বৃটিশ শাসনের ফলাফল গুলো মার্কসের দৃষ্টিতে :

(১) "মুঘলদের আমলের চেয়েও দৃঢ় সংঘবদ্ধ এবং বিস্তৃত...রাজনৈতিক ঐক্য;" "ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের দ্বারা উহা দৃঢ়তর এবং চিরস্থায়ী" হইতে বাধ্য।

(২) "দেশীয় সৈন্য বাহিনী" (ইহা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং ক্রমে সুচিন্তিতভাবে সমগ্র বাহিনীর এক তৃতীয়াংশ বৃটিশ সৈন্য দ্বারা ভরিয়া ফেলা এবং বৃটিশের সামরিক কর্ত্তৃত্ব দৃঢ় করিয়া তোলার আগের কথা);

(৩) "স্বাধীন সংবাদপত্র — এশিয়ার সমাজে এই প্রথম আবির্ভাব" (ইহা ১৮৩৫ সালে ভারতে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার ঘোষণার পরের কথা এবং ১৮৭৩ সাল হইতে শুরু করিয়া যে সব প্রেস আইন চালু হয় ও আধুনিক যুগে পতনশীল সাম্রাজবাদী শাসনের আমলে যাহাদের কড়াকড়ি বাড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহাদের আগের কথা);

(৪) " এশিয়ার সমাজের প্রধান আকাঙখা — জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা" প্রতিষ্ঠা;

(৫) শর্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যতদুর সম্ভব কম করিয়াও হোক না কেন, "শাসন চালাইবার গুনাবলী সম্পন্ন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত" এক শিক্ষিত ভারতীয় শ্রেণী গঠন;

(৬) বাষ্পযানের সাহায্য "ইউরোপের সহিত নিয়মিত এবং দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন।"

মার্কসের এই সম্মিলিত উদ্ধৃতিটি পাওয়া গেছে রজনী নাম দত্তের "আজিকার ভারত" গ্রন্থ থেকে। এর সঙ্গে সপ্তম প্রতিক্রিয়া হিসেবে সহজেই যোগ করা যায়।

(৭) ধনতন্ত্রের বিকাশ ও রেলপথ স্থাপন এবং "তার মধ্য থেকেই গড়ে উঠবে শিল্পের এমন সব শাখায় যন্ত্রশিল্পের প্রয়োগ রেলপথের সঙ্গে যার আশু সম্পর্ক নেই। তাই এই রেলপথই হবে ভারতে সত্যকার আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত।"

কিন্তু ১৯৪৭ সালে বৃটিশরা যখন এ দেশকে বিভক্ত করে বিদায় নিল তখন বর্তমান বাংলাদেশ অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কি সামাজিক স্তরে ছিল তার নির্ণয় করলে দেখা যাবে বৃটিশরা বাংলাদেশের কি কি পরিবর্তন সাধন করতে পেরেছিল। তত্ত্বগতভাবে উপরের ছয়টি সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের বেলায় ও প্রযোজ্য কিন্তু বিচার্য্য বিষয় ধনতান্ত্রিক বিকাশের প্রশ্ন।

যে অঞ্চল নিয়ে আজকের বাংলাদেশ তা তৎকালীন বাংলার পশ্চাদপট ছিল মাত্র — পশ্চিম বাংলাই ছিল রাজধানী সংলগ্নতার (Spread effect)

সুবিধাভোগী অঞ্চল । যে সামাজিক দ্বৈত্তা সব অনুন্নত সমাজেই সৃষ্টি হয় বাংলায়ও তাই হয়েছিল—একটা অঞ্চল আস্তে আস্তে শিল্পোন্নয়নে বেড়ে ওঠে আর অন্য বিরাট অঞ্চল পড়ে থাকে কৃষি ভিত্তিক এবং অবহেলিত । দেশ বিভাগের সময় দেখা গেল খুব সরল ভাবে এই দ্বৈততার দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দুটো অঞ্চলকে আলাদা কতে ফেলেছে । বর্তমান বাংলার অবস্থা দেখা গেল সবচেয়ে খারাপ কিন্তু সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ।

১৯৪৭—৪৮ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশে রেল লাইন পাতা হয়েছে ১, ৬১৫ মাইল (রুট মাইলেজ) । এবং শিল্পোন্নয়ন বলতে তেমন কোন শিল্পই এখানে নেই । বাংলাদেয়েই পাটের চাষ হয় কিন্তু শিল্পাঞ্চলের পুরোটাই পড়েছে ভারতে তথা পশ্চিম বাংলায় । অথচ তখন পশ্চিমবঙ্গে পাট কল ছিল ৯৩ টি, তাতে দৈনিক শ্রমিক সংখ্যা ছিল ২, ৮৯,000 শ্রমিক । আর সম্পূর্ন বাংলাদেশে একটিও পাটকল ছিল না । শিল্পকারখানার কোন পুরাতন কাঠামো না থাকার জন্যে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠি আবার সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা মিয়ে বাংলাদেশেকে শোষন করে তাদের নিজস্ব অর্থনীতি গড়ে তুললো । এবং সত্যিকার ভাবে বাংলাদেশের শিল্পোয়েনের গোটা আন্দোলন টাই সংঘবদ্ধভাবে পড়ে ওঠে পাকিস্তানী আমলে । জমিদারী প্রথা বা ১৯৫১ সালের ষ্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট, ৫১ সালে গ্রহন করা হলেও কার্যকরি হয় ১৯৫৮ সালে । ১৯৪৭—৭১ পর্যন্ত যে ধনতান্ত্রিক বিকাশ তার মধ্যেই সবচেয়ে গভীরভাবে উন্মেচিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি এবং রূপলাভ করেছে বাংলাদেশের জাতীয় চরিত্র (ভূমিকা দ্রষ্টব্য) ।

এই দীর্ঘ ভূমিকার পটভূমিতে আমরা সহজ কতগুলো সিদ্ধান্তে আসতে পারি। প্রথমতঃ বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসের প্রথম শর্ত হচ্ছে কৃষি অর্থনীতিকে স্বাধীন ও সার্বতৌম করে তোলা । এবং এই সার্বভৌমত্ব একমাত্র জমির সাধারন মালিকানা ও যৌথ খামার আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই সম্ভবপর । বস্তুত দেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে কৃষির পটভূমিতে যে লুপ্ত নৈরাজ্য রয়েছে তাকে ভেঙ্গে দিয়ে একদিন ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ-রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু আজকে বিস্তৃত ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষনের পর এ কথা সহজেই বলতে পারি—যেহেতু "এশীয় উৎপাদম পদ্ধতি" পৃথিবী অদ্বৈত্তাবাদী ঐতিহাসিকদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে প্রমান করেছে কোন কোন সমাজে সরল (লিনিয়ার)

ঐতিহাসিক তত্ত্বখাটে না — তাই চীনের সমাজতন্ত্রের পটভূমি রচনায় যে কমিউনগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে তা বাস্তবিক প্রাক-ধনতান্ত্রিক নৈরাজ্য থেকে সমাজতান্ত্রিক নৈরাজ্যে যাত্রার প্রথম প্রতিশ্রুতি।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হচ্ছে; বাংলাদেশের সার্বিক ধনতান্ত্রিক বিকাশ শুরু হয় পাকিস্তানী আমলে এবং তা অসম্পূর্ণ ভাবেই রয়ে গেছে। এই অসম্পুর্ণ সমাজ কাঠামোকে সম্পুর্ণ করা ব্যাতিত বাংলাদেশের অর্থনীতি সার্বতৌমত্ব লাভ করতে পারে না। এখানে আরো উল্লেখ যোগ্য পাকিস্তানী শিল্প কাঠামোকে এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল যাতে তা স্বাধীন হয় এবং বাংলাদেশ পাকিস্তানের পরমুখপেক্ষী হয়ে থাকে। বাংলাদেশের এই পরমুখপেক্ষী-অর্থনীতিকে স্বাধীন ও সার্বতৌম করতে হলে ব্যাপকতর শিল্পায়ন অপরিহার্য। এই শিল্পায়নের আন্দোলনে হয় সরকারকে অবিলম্বে এগিয়ে আসতে হবে অথবা যাতে পুঁজিপতিরা এগিয়ে অসে তার জন্যে আইনানুগ ও আর্থিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই দ্বিবিধ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যতই বিলম্ব হবে ততই বাংলাদেশ একটি নতুন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে গিয়ে পড়বে।

—আলী মনোয়ার

বাংলাদেশের সাহিত্য

উনিশ শ' বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি যদি কোন সাহিত্যিক বিচ্যুতি সম্পর্কে সচেতন করে থাকে আমাদের তবে সে বিচ্যুতি হচ্ছে ধর্মীয় অত্যুৎসাহের বিচ্যুতি। এই বিচ্যুতি এসেছে ভ্রম থেকে। দেশের উঠতি মধ্য বিত্তের মধ্যে এমন ভ্রমের সৃষ্টি হয়ে ছিল যে দেশ স্বাধীন হয়েছে। বলাবাহল্য, এই ভ্রমের উৎপত্তি সাতচল্লিশ থেকেই। সেই যখন রটনা করা হল স্বাধীন হয়েছে দেশ তখন থেকেই সূচনা এই ভ্রান্তিবিলাসের। স্বাধীন যে হয়েছি তার প্রামাণ কি ? কেন, প্রমাণ হচ্ছে মুসলমানরা মুসলমানদের শাসন করছে, আর মুসলমান হচ্ছে মুসলমানের ভাই। লেখক-সাহিত্যিক-বুদ্ধি জীবীদের বেশীর ভাগ লোক নিজেদের মুসলমানত্ব নিয়ে আস্ফালন শুরু করেছিলেন। নিজস্ব তাহজীব-তমদ্দুন, স্বতন্ত্র ঐতিহ্য, বিশিষ্ট ইতিহাস নিয়ে হুলস্থূল চলেছে। যারা দেখতে পেলেন না স্বাধীনতা তাঁরা হয় একেবারে চুপ করে গেলেন, নয়ত সন্ধি করলেন, নইলে চলে গেলেন জেলে। পাকিস্তানী মানসিকতার যে উপদ্রব শুরু হয়েছিল, আলবদদের অবির্ভাব সেই মানসিকতারই পরিণত ফল। প্রকাশ্য উদ্দীপনার গোপন অন্ধকারে লালিত দস্যুরা যখন দেখল দেশের সব মানুষ একত্র হয়ে কারাগারটাকে ভেঙ্গে ফেলতে উদ্যত হয়েছে তখম উন্মত্ত হয়ে তারা হত্যা করেছে বুদ্ধিজীবীদের।

কিন্তু সেটাই একমাত্র বিচ্যুতি ছিল না আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের। বিচ্যুতি আরো একটা ছিল। যেটা গড়ে উঠছিল আলবদর-ধারার পাশাপাশি। এর নাম আধুনিকতা। এর প্ররোচনায় আমরা, শিক্ষিতেরা,

প্রচার করেছি আমরা সভ্য, সংস্কৃত, মার্জিত, আমরা ইউরোপ-আমরিকার যুদ্ধ পরবর্তী সাংস্কৃতিক জীবনের অংশভাগী। অর্থাৎ আমরা দেশের অশিক্ষিত মানুষগুলোর মত নই।

এই দুই ধারা পরস্পরবিরোধী। একটা গ্রাম্য, অন্যটা নাগরিক। একটা মার খেয়ে লুকিয়েছে, অন্যটা অতিপ্রকাশ্যে শনৈঃ শনৈঃ বিকশিত হচ্ছে। কিন্তু উভয়ই বিচ্যুতি—জীবন থেকে, দেশের সাধারণ মানুষের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। এইখানে আলবদর ও হিপ্পিতে কোন ভেদাভেদ নেই। মুখ একটাই, মুখোশ শুধু ভিন্ন ভিন্ন। উভয়েই পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে দেশীয় শাসক ও তাদের বিদেশী কর্তাদের কাছ থেকে।

দুই বিচ্যুতির মাঝখান দিয়ে দরিদ্র জীবনের ম্রিয়মান স্রোত বয়ে গেছে। এই স্রোত শত শত বছরের পুরানো। তার গতি বাড়েনি বরং দিনে দিনে তার স্তব্ধ স্রোতে আবিলতা বেড়েছে।

সাহিত্যের ও ঐ দুই ধারা। দু'টির কোনটিই দেশের জীবনকে ধরতে পারেনি। বাংলা সাহিত্যে এমনিতেই কৃষকের জীবন অতিস্পষ্ট ভাবে উপেক্ষিত। তার উপর পাকিস্তানী বিচ্যুতি এসে লেখকদেরকে জীবন থেকে আরো দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আলবদরেরা মক্কা-মদিনার দিকে ধাবিত হয়েছে, হিপ্পিরা ছুটেছেন সেই পশ্চিমেরও দূরের পশ্চিমে। এতে সাহিত্যের ক্ষতি হয়েছে, ক্ষতি হয়েছে জীবনেরও।

সাহিত্যের ক্ষতিটা কি ?

এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে দেশের বৃহত্তর জীবনকে নিজের মধ্যে ধারণ করতে না পারলে কোন সাহিত্যই মহৎ হয়ে উঠতে পারে না। সে থাকে ক্ষীনজ্ঞান ও অতিসামান্য হয়ে। গত তেইশ-চব্বিশ বছরের সাহিত্যের আঙ্গিকে, কৌশলে, ভাষাব্যবহারে দক্ষতার প্রকাশ পায়নি এমন নয়। এও বলা যাবে না যে সে সাহিত্যে দারিদ্র্যের ছবি, প্রকৃতির বর্ণনা স্থান প্রায়নি। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা হল, এই সাহিত্যে দেশের দৃশ্যমান অবয়বের ভেতর অন্তর্নিহিত যে সত্তা আছে, অছে অনুভব ও বিবেচনার যে-রাজ্য তাকে কতটা নিজের মধ্যে ধারণ করতে, ধারন করে নিজের সত্তার মধ্যে দিয়ে প্রবহমান করতে পেরেছে। পারেনি। তেমনভাবে পারেনি যেমনভাবে পারলে সাংবাদিক বর্ণনা কালজয়ী সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়।

ফলে এই দেশের অন্তরের মধ্যে কি আছে, কতটা আছে, কোথায়

আছে সে-খবরটা আমাদের জানা হয়নি। বাইরে থেকে এইটুকু আমরা জেনেছি যে দেশের সামগ্রিক যে সত্তা তার হৃদয়ের ভেতর আতঙ্ক আছে, তার বুদ্ধির মধ্যে আছে অন্ধকার ও জড়তা। হৃদয় যে আতঙ্কিত তার প্রমাণ পাওয়া যায় আমাদের অব্যাহত দৈব নির্ভরতায়, স্বজোত্যাভিমানী অন্তর্মুখীনতায় ও পৌত্তলিক বীর পূজায়। প্রকৃতিকে আমরা বশ করতে পারিনি, তাই প্রকৃতি আমাদেরকে বশ করেছে, বশ করে মনুষের তুলনায় হীনতর প্রাণীতে পরিণত করেছে। সেই কারণে বুদ্ধির মধ্যে অন্ধকার জমেছে, জমেছে সংস্কারবেষ্টিত জড়তা। আমাদের জমিতে জঙ্গলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সমান উর্বরতা, বন্ধ্যাত্ব শুধু উদ্ভাবনশীলতায়।

কিন্তু এই হৃদয় বুদ্ধিকে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা তেমনভাবে পাইনি যেমন ভাবে পেলে তাদের জ্ঞান আমাদের চেতনার অবিভাজ্য অশং হয়ে দাঁড়াত, আমরা সকলে সম্মিলিত হয়ে আতঙ্ককে, অন্ধকারকে, জড়তাকে পার হয়ে যেতে পারতাম। বাংলাদেশের হৃদয়ে শুধু আতঙ্কই নেই, সেই হৃদয়ে বিবেক আছে, আছে মনুষের প্রতি অকৃপণ ভালোবাসা, অত্যাচারীর প্রতি অকৃত্রিম ঘৃণা। তাকেও দূর থেকে দেখেছি আমরা, হয়ত কিছুটা জেনেছি বুদ্ধি দিয়ে, কিন্তু তাকে আলরা আমাদের রক্তের মধ্যে স্বতঃবর্দ্ধমান করে তুলতে পারিনি। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যেতে পারে এই কথা যে সেই শুরুর কাল থেকে অদ্যাবধি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক যাঁরা তাঁরা প্রায় কেউই এখন যার নাম বাংলাদেশ সেই দেশের মানুষ ছিলেন না। এর ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এর সাহিত্যিক ও লৌকিক তাৎপর্য এই যে এই অঞ্চলের সত্তা কখনো উন্মোচিত হয়নি সাহিত্যে। বলা বাহুল্য সাহিত্যের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানই সবচেয়ে বেশী স্থায়ী ও গভীর।

সাহিত্যের এই ব্যর্থতায় শুধু সাহিত্যেরই ক্ষতি হয়নি, ক্ষতি হয়েছে জনজীবনেরও।

আমাদের জনজীবনের একদিকে আছে বশ্যতা, অন্যদিকে বিদ্রোহ। এই দুই বিপরীতকে একত্র করতে পারলে সংহত শক্তির উদ্ভব ঘটত। কিন্তু তা ঘটেনি। ঘটার একটা পথ হতে পারত রাজনীতি। দেশে যদি প্রচলন থাকত গণতান্ত্রিক রাজনীতির, যদি স্বাধীনতা থাকত সংগঠন ও মতামতের তবে নিরুপায় অধীনতা ও সর্বস্বপণ বহূৎসবের মধ্যবর্তী পন্থা গ্রহণ করে সংঘবদ্ধ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের পত্তন ঘটানো সম্ভব হত।

অন্য একটা পথ গড়ে উঠতে পারত শিক্ষার মধ্য দিয়ে। কিন্তু পাকিস্তানের কালে শিক্ষা ব্যবস্থার আদৌ কোন আগ্রহ ছিল না এরকম কোন পথ গড়ে তোলার। শিক্ষা বরং মিয়োজিত ছিল ভিন্ন এক কাজে। সে কাজ হল জনজীবন বিচ্ছিন্ন ও আত্মসচেতন এমন একটা শ্রেণী গড়ে তোলা যারা নিজেদের বিচ্ছিন্নতাকে আভিজাত্যের লক্ষণ বলে গণ্য করবে। আলবদরই বলি আর হিপ্পিই বলি—দুই বিপরীত নামে তারা একই শিক্ষা ব্যবস্থারই কুফল।

রাজনীতি ও শিক্ষার অতি স্পষ্ট ব্যর্থতার দরুন সাহিত্যের উপর দায়িত্ব এসেছিল বশ্যতা ও বিদ্রোহকে একত্র করে বশ্যতার মধ্যে বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহের মধ্যে শৃঙখলা প্রতিষ্ঠিত করে নতুন শক্তির উন্মোচন ঘটানোর। সাহিত্য সে-দায়িত্ব পালন করেনি।

আজ আবার আমরা স্বাধীন হয়েছি। এই স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তানী স্বাধীনতার তুলনায় অনেক বেশী মূল্য দিতে হয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতায় গুণগত উৎকর্ষ তখনি প্রমাণিত হবে যখন আমরা সেই বৃহৎ কারাগারটিকে ভেঙ্গে ফেলতে পারব যে-কারাগার আমরা আটক ছিলাম পাকিস্তানী স্বাধীনতার দিনগুলোতে। যখন পরিবর্তন আসবে সামাজিক অচলায়তনে, আসবে মানুষে মানুষে সম্পর্কে। এর জন্য শক্তির উদ্বোধন আবশ্যক। উদ্বোধনের পথে অন্তরায় আছে অভাবের, আছে অসম ধনবণ্টনের দুঃসহ অন্যায়ের। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। প্রত্যাশা তেমন মানসিকতা সৃষ্টির, যে-মানসিকতা সকল অন্তরায়, সমুদয় প্রতিবন্ধক ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারবে, যে মানসিকতা সংগঠন, আন্দোলন ও বিপ্লবের বহু বিলম্বিত কাজকে ত্বরান্বিত করে দেবে। সে-মানসিকতা সৃষ্টির জন্য একই সঙ্গে দু'টি কাজ করতে হবে সাহিত্যকে। প্রথম কাজ, দেশের হৃদয় ও বুদ্ধিকে সকলের কাছে তুলে ধরা এবং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে ঐক্য গড়ে তোলা। বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা কঠিন কাজ, তার চেয়েও কঠিন এবং জরুরী কাজ হচ্ছে বাংলাদেশের হৃদয়-বুদ্ধির ইতিহাস রচনা করা। বিগত দিনে ধর্মকে আমরা আকড়ে ধরেছিলাম ঐক্যের রশি হিসেবে, সেই রশি ছিঁড়ে অতি মর্মান্তিক দুর্ভোগ ঘটেছে আমাদের কপালে। আজকে ঐক্যের নতুন বন্ধন আমাদেরকে খুঁজতে হবে, এবং তাকে পাওয়া যেতে পারে সাহিত্যের কাছে। সাহিত্যের দ্বিতীয় কাজ, বশ্যতা ও বিদ্রোহকে মিলিত করে নতুন শক্তির উন্মোষ ঘটানো। এই দুই কাজ সাহিত্যকে করতে হবে কোন অসাহিত্যিক উৎসাহ বা বহির্জাগতিক

আদর্শবাদের তাড়নায় নয়, নিজস্ব সার্থকতা অর্জনের বাস্তাবিক প্রয়োজনে।

সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম বিচ্যুতির অবসান ঘটেনি, সাময়িকভাবে সে আত্মগোপন করেছে মাত্র। শত শত বছরের এই পুরানো ব্যাধি সুযোগ পেলেই আবার আক্রমণ করবে। দ্বিতীয় বিচ্যুতির এখন পোয়াবারো চলছে। এর প্রধান কারণ অবশ্যি আমাদের জীবনের সাধারণ উদ্দেশ্যহীনতা। এতকাল ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করাই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে আমরা জেনেছি। এখন শিক্ষিত মানুষ, অর্থাৎ সমাজে বীর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত মানুষ, আত্মস্বার্থসিদ্ধিকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছে। তার মানে একজন মানুষের লক্ষ্য অন্য জনের লক্ষ্যের পরিপন্থী। সেইখান থেকে এসেছে নৈরাজ্য। এই দুই বিচ্যুতির মাঝখানে গিয়ে আজ আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে।

আমরা সকলেই লেখক নই, কিন্তু দায়িত্ব ও প্রয়োজনবোধের সূত্র ধরে আমরা একতাবদ্ধ হতে পারি, এবং সেই ঐক্য থেকে পারস্পরিক মিলন ও অগ্রগতির পথ তৈরী হবে। এটা কোন দুরাশা নয়। দুরাশা যে, এই কথাই একুশে ফেব্রুয়ারির মত দিন এসে প্রতি বছর আমাদেরকে স্মরন করিয়ে দিয়ে যায় নতুন করে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বাংলাদেশের কবিতার পালাবদলের ভূমিকা

কবিতার সঙ্গে একজন কবির সম্পর্ক কী, কী সম্পর্ক একজন পাঠকের এবং এই প্রশ্নকে আরো ব্যাপক ক'রে তুলতে গিয়ে যদি প্রশ্ন করা হয়, মানবজীবন এবং সভ্যতার কাছে কবিতার উপযোগিতা কী, একটি মাত্র উক্তিতে তার উত্তর দেয়া সম্ভব, কিন্তু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ সে উত্তর। বলা যেতে পারে, কবিতা জীবন আবিষ্কারের সাধনা। কবি বলতে পারেন, আমি জীবন আবিষ্কারের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি, পাঠক বলতে পারেন, আমি কবিতার মুকুরে আমার অচেনা চরিত্রের বিচিত্র চিত্র অধ্যয়নের প্রয়াসে ব্যাপৃত। এ সমস্ত উক্তির যথার্থ্য নির্ণয়ের জন্য আজ আর আমাদের অতীত ইতিহাস উদ্ঘাটনের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই কালে কালে কবিতার পালাবদলকে সবিস্তারে বর্ণনার।

আমাদের সৌভাগ্য, ভাষার প্রশ্নটি তখনই তুলতে হয়েছিলো। নতুন রাষ্ট্র স্বাভাবিক ভাবেই দাবী জানিয়েছিলো এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য। এবং জিন্নাহ্ সাহেবের একটি মাত্র উক্তিতেই আমাদের জানা হয়ে গিয়েছিলো সমস্ত ভবিষ্যৎ। সদস্ত সেই উক্তিই ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতির উপনিবেশিক চরিত্র আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করেছিলো। পরিবেশ অবশ্য মোহাবিষ্ট ছিলো কিন্তু তরুণ সমাজ সে মোহে আচ্ছন্ন ছিলোনা। তারা চীৎকার করে জানিয়ে দিয়েছিলো, এমন হতেই পারেনা। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীর দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠের ভাষা উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হতেই পারে না। আমরা তা হতে দেব না।

এবং এখান থেকেই শুরু। এই শুরু থেকেই। গড্ডালিকা যে ছিলো এ কথা অস্বীকার করবো না। এমন কি ভাষার প্রশ্নে ঐক্যমত পোষণ করেও মনমানসে স্ববিরোধিতা ছিলো প্রবল। কিন্তু এরই মধ্য থেকে চিহ্নিত হয়ে ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে আসছিলেন স্বভাববিদ্রোহী একদল তরুণ কবি—যাঁরা ক্রমান্বয়ে সংহত হচ্ছিলেন চারদিকে সতর্ক পাহারা রেখে। এবং বায়ান্নর সেই চরম আঘাতই তাদের সমগ্র সত্ত্বায় দুঃসাহসের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ফলে, প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর

বিবেচনায় বাজেয়াফ্‌ত হওয়ার যোগ্য একুশের সংকলন বেরিয়ে আসে বাইরে।

দিনে দিনে পীড়নের মাত্রা বাড়তে থাকে। প্রকাশ্য পথ থেকে সরে গিয়ে নানা অদৃশ্য শৃঙখলে বাঙালীত্বকে বেঁধে ফেলবার, তাকে রুদ্ধশ্বাস করে হত্যা করবার নানা কৌশল এগিয়ে আসতে থাকে। আর সে সব কৌশল যখনই ব্যর্থ হয়েছে, যেখানেই ব্যর্থ হয়েছে, নির্যাতনের নখর তখনই বেরিয়ে এসেছে রঙিন আবরন ভেদ করে।

বাংলাদেশের কবিরাও, সেই সব চিহ্নিত কবিরা এবার তাই নতুন পথে এগোলেন। আশ্রয় নিলেন প্রতীকের। নানা প্রতীকে এবার সচেতন পাঠকের কাছে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকল বাংলাদেশের নির্যাতিত মুখ, ছিন্নভিন্ন অবয়বের রক্তাক্ত অস্তিত্ব। দলন এবং পীড়নের গোপন অস্ত্র, অত্যাচারী কংসের সংবাদ পাঠকদের কাছে পেঁাছে দেয়া হলো ভিন্নভিন্ন প্রতীকে। এক কথায় সোজা পথে এগোবার পথ না পেয়ে এই সচেতন কবিগোষ্ঠী পথ থেকে সরে যাননি, তাঁরা বাঁক ঘুরে ঘুরে দিনে দিনে ক্রমান্বয়ে এগিয়েছেন। চলতে হয়েছে তাঁদের সামনে পেছনে দৃষ্টি জাগ্রত রেখে। এই সঙ্গে এও অনস্বীকার্য যে, এরই পাশেপাশে আমরা গণবিমুখ ধর্মান্ধতা দেখেছি, দেখেছি গোষ্ঠীবিশেষে আত্মকেন্দ্রিকতার আবডাল! পলায়নী মনোবৃত্তির দেয়াল তুলে আত্মরক্ষার প্রয়াসও অনুপস্থিত ছিলো না। কিন্তু অগ্রসর তরুণ্য অপরাজেয় তাই সেই অন্ধকার দিনগুলোতেও আকাঙখার উত্তরণ প্রয়াসের দীপশিখা কবিতার শরীর থেকে নিবে যেতে পারেনি।

আগুন জ্বলছিলো। ক্রমান্বয়ে জ্বলছিলো। এবং আড়ালে আড়ালে হৃদয় থেকে হৃদয়ে তা সঞ্চারিত হচ্ছিলো। এই সঞ্চরণ এবং প্রসার এইইত আমাদের জীবনে কবিতার যথার্থ সংলগ্নতার, যথার্থ সংযোগ এবং মানস-জীবনে কবিতার সর্বশেষ মাইমমার, অবদান।

একুশের নির্মমতা এবং নগ্নতা বাঙালীর চিত্তে যে দাহ সৃষ্টি করেছিলো দিনে দিনে তাই-ই এক অগ্নিগিরিকে বিস্তৃত করে দিয়েছিল সমগ্র বাংলাদেশ। একদা সেই অগ্নিগিরি বিস্ফোরিত হলো আর সঙ্গে সঙ্গে কবিতার সমগ্র শরীরে সে কি প্রচণ্ড বিসফার!

হানাদার কবলিত বাংলাদেশ যাঁরা আটক ছিলেন যাঁরা পালাতে পারেন নি ভিন্ন ভিন্ন কারনে তাঁরাও লিখলেন লুকিয়ে লুকিয়ে। গ্রাম থেকে গ্রামে পালাতে পালাতে কেউ কেউ সংগের শাদা পাতার খাতাটি

ভরে তুললেন বিক্ষোভ এবং যন্ত্রনাময় শব্দরাজিতে এবং একজন অন্তত ঝুঁকি নিলেন ; আরো বেশি দুঃসাহসী হয়ে উঠলেন তিনি। বিশ্বস্তত যোগাযোগকারিদের মাধ্যমে তিনি কেই দুঃসহ অভিজ্ঞতা, বিক্ষোভ এবং যন্ত্রনার্ত শব্দরাজিকে পাঠিয়ে দিলেন বন্ধুদেশে ভারতের পত্রপত্রিকায় এবং বোধগম্য কারনেই ছদ্মনামে। স্বাধীনতা অর্জনের পরেই অন্তত দুজন প্রতিষ্ঠিত কবির যে সব কবিতা তাঁদের কাছ থেকে ক্রমাগত স্বাধীন বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখেছি আর তাতে যন্ত্রণা বিক্ষোভ এবং শপথের যে অসংখ্য স্বাক্ষর আমরা দেখেছি তাতে ক'রে বন্দী ন'মাসে আমার নিজের অক্ষমতায় আমি লাঞ্ছিত বোধ ক'রেছি। ক্রমাগত পলায়নরত এই চরম দুদিনেও মানসিক ভারসাম্য রক্ষার এই নিদর্শন নিজের কবিকর্মের প্রতি যে বলিষ্ঠ সততার সাক্ষ্য বহন করে তা আমাদের অভিভূত না করে পারে না ।

কিন্তু এর চেয়েও বিস্ময়ের মুখোমুখি হয়েছি আমরা তখনই যখন আমরা স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান শুনেছি । পলাতক বা আত্মকেন্দ্রিক বলে যে তরুণ কবিগোষ্ঠিকে প্রত্যাবর্তনের উপদেশ দেবার স্পর্ধা দেখিয়েছি একদিন আমরাই, আজ শুনছি, তাদেরই বজ্রকন্ঠে স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি যার ছত্রে ছত্রে ঝরে পড়ছে বিক্ষোভের জ্বালা বিদ্রোহের আগুন এবং সংগ্রামের ইস্পাত কঠিন শপথ ।

বর্লা যায় না কি যে ইতিহাসের এই সাগ্নিক সন্ধিক্ষনেই নতুন কবি ও কবিতার জন্ম দিচ্ছিলো । বলা যায় না কি, ইতিহাস তার প্রয়োজনে পুরনো কবিকে বদলে নতুন করে বানিয়ে নিচ্ছিলো। তার এ কেবল ইতিহাসের দাবী নয়, অবদানও ।

তাই যেমন বলা চলে কবিতার পালাবদল সামাজিক ইতিহাসে নুতন অধ্যায় সংযোজিত করে তেমনি আবার এও অনস্বীকার্য যে, ইতিহাসের পালাবদল কবিতাকে উত্তীর্ন করে নতুন তাৎপর্যে । কবিতা বদলে যায়, কবিও। তার আত্মা নিজেকে যুক্ত করে নেয় নির্মিয়মান নুতন সমাজের আত্মার সঙ্গে , শরীর সজ্জিত করে' উদ্দীপনাময়, নূতন সমাজের বনাঢ্য ভূষনে ।

আজ আমরা সেই উত্তরনের সীমান্তে দাঁড়িয়ে । কেবল, না না!, এই রব আর নয় । জীবনকে অনস্বীকার করা নয় । জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে নষ্ট জীবনের মাহিমাকীর্তন আর নয় ।

—আহসান হাবীব

বাংলাদেশের ছোটগল্প

একালের ছোটগল্পের চারিত্র্য ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং এর শিল্পরূপের স্বরূপ-সন্ধান করতে গেলে স্বভাবতই কিছুটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের দিকে ফিরে তাকাতে হয়। কারণ, একালের ছোটগল্প নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর অতিক্রম করে বিভিন্ন ব্যক্তি-প্রতিভার অবদানে যে রূপরীতি এবং চারিত্র্যধর্ম অর্জন করেছে, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সংস্থাপিত না করে এর বিবর্তন ধারার যথার্থ স্বরূপটি অবলোকন করা সম্ভব নয়। সাধারণভাবে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এবং বিশেষভাবে বাংলংদেশের সাহিত্যে ছোটগল্প কি চেহারা এবং চারিত্র্য পেয়েছে তা অনুধাবনের জন্যে ছোটগল্পের ঐতিহাসিক বিবর্তনধারা এবং ক্রমবিকাশের সংক্ষেপিত উল্লেখ প্রয়োজন।

ছোটগল্প একটি বিশেষ আঙ্গিকের শিল্পরচনা ; এবং সব শিল্পের মতোই এর নানা রকম সংজ্ঞা নিরূপিত হওয়া সত্ত্বেও, কোন একটি বিশেষ কিংবা সুনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞাতেই ছোটগল্পের চারিত্র্যে ধর্ম এবং রূপপ্রকৃতি খুঁজে পাওয়া কঠিন, কারণ, মূলগতভাবে কোনো একটি বিশেষ রূপরীতির বা আঙ্গিকের শিল্পকর্মে কতকগুলো মৌলিক সত্য নিহিত থাকলেও, ব্যক্তি-প্রতিভার অবদান এবং কল্যাণে তাতেও পরিবর্তন ও বিবর্তনধারার স্পর্শ লাগে, সুনির্দ্দিষ্ট এবং নিরূপিত শিল্প রূপেরও প্রকৃতি বদলায়। 'ছোটগল্প' এই কথাটির মধ্যে প্রায় সর্বজন স্বীকৃতরূপেই এই সংজ্ঞা নিরূপিত যে, এই বিশেষ আঙ্গিক এবং রূপরীতির সাহিত্যকর্মে কাহিনী বা আখ্যানভাগ হবে আকারে ছোট এবং প্রকৃতিতে গল্পধর্মী; অর্থাৎ একটি স্বল্প-পরিসর রচনায় এর স্রষ্টাকে

অবশ্যই একটি অকর্ষণীয় এবং রসমণ্ডিত কাহিনী উপহার দিতে হবে। এই 'কাহিনী' বা 'আখ্যান' প্রসঙ্গেই স্বভাবতই উপন্যাসের প্রসঙ্গও আসে। এবং উপন্যাস ও ছোটগল্পের আঙ্গিক ও শিল্পরূপের প্রকৃতি বিচারের প্রশ্নে এ-জিজ্ঞাসা ও মনে জাগে যে, শুধু কাহিনী বা আখ্যান-ভাগের 'বিস্তৃতি' এবং 'সংক্ষিপ্তি'—এর মধ্যেই কি এই দুই স্বতন্ত্রধর্মী শিল্পকর্মের পার্থক্য বিদ্যমান, না, মূলগতভাবে এই দুইয়ে আরও গভীর কোনো স্বাতন্ত্র্য অন্তর্গত ? এ জিজ্ঞাসা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন পর্যালোচনায় লক্ষ্য করা যায় যে, উপন্যাস রচনায় যে-কথাশিল্পী পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেন, ছোটগল্প রচনায় তাঁর শিল্প সাফল্য তুল্যমূল্য হারায়, কিংবা তাঁকে আদৌ ছোটগল্প রচনায় ব্রতী হতে দেখা যায় না। গভীর এবং গভীরতর বিশ্লেষণে এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে হয় যে, উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পের আঙ্গিক এবং শিল্পরূপ প্রকৃতি ধর্মে ও চারিত্র্যে একান্তরূপেই স্বতন্ত্র, এবং কথাশিল্পী মাত্রেরই এই বিশেষ আঙ্গিক ও রূপরীতির রচনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। উপন্যাস এবং ছোটগল্প—এই দুই-ই কোনো না কোন কাহিনী এবং সমাজ-পটভূমির অপেক্ষা রাখে। কারণ, উপন্যাস এবং ছোটগল্‌প নিছক কল্‌পনার দৃষ্টি কিংবা মনোজ শিল্পকর্ম নয়। কবির পক্ষে একান্তরূপে কল্‌পনা-নির্ভর এবং দেশকাল-নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব কিন্তু কথাশিল্‌পীর পক্ষে ঠিক তেমনভাবে সমাজ-নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব হয় না, কেননা চরিত্র এবং চরিত্রের মন-মানস নিয়েই কথাশিল্‌পীর কারবার, যেহেতু চরিত্র সমাজ-নিরপেক্ষ কিছু নয়, কোনো না কোনো সমাজে তাদের অধিবাস সে কারণে কথাশিল্‌পে সমাজ-পটভূমি কোনো না কোনোভাবে এসেই যায়। শুধু বৃহত্তর পটভূমির উপন্যাস এবং সামাজিক আলেখ্যেই নয়, এমন কি বাংলা ছোটগল্‌পের আদি এবং মধ্য-পর্বেও—এই বিশেষ আঙ্গিক ও রূপরীতির শিল্পকর্মে সমাজ-পটভূমি এবং বৃহত্তর সমাজনির্ভর চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। বলাবাহুল্য, বৃহত্তর সমাজ-পটভূমি কিংবা ঐ পটভূমিতে বিচরণশীল চরিত্রসমূহের প্রাধান্যের ওপর ছোটগল্‌প কি উপন্যাস, এর কোনোটিরই প্রকৃতিধর্ম নির্ভর করেনা, বস্তুতঃ এ একান্তভাবেই নির্ভর করে কথাশিল্‌পীর আঙ্গিক-সচেতনতা, রচনায় শিল্‌পরূপ সম্পর্কে অবহিতি এবং সর্বোপরি তিনি আখ্যায়িকার মধ্যে মানুষের জীবন অথবা জীবনের প্রতীক-রূপ যে-ভাবে ফুটিয়ে তুলতে অভিলাষী এবং পারঙ্গম— তার উপর।

বাংলা কাহিনী-কাব্য বা আখ্যানকাব্যে ছোটগল্‌পের আদল বা ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও, আসলে উনবিংশ শতকে ইউরোপীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার আগে পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্‌পের জন্ম হয়নি। ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় এ-সত্য ধরা পড়ে যে, বাংলা সাহিত্যে আদিতে ছোটগল্‌প সজ্জিত হয়েছিল ইউরোপীয়—বিশেষতঃ ফরাসী ছোটগল্‌পের আঙ্গিকে এবং অনুবাদ ও রূপান্তরের পথ ধরে। স্মর্তব্য যে, আঙ্গিকের বিবর্তন এবং নানা রূপান্তর সত্ত্বেও, উপন্যাসের তুলনায় বাংলা ছোটগল্‌পে যে প্রতীকধর্মিতা, ইঙ্গিতময়তা, রূপকধর্মিতা এবং মনোবিশ্লেষণের প্রাধান্য তার ও মূল কারণ সম্ভবতঃ এই আদি-ইউয়োপীয় প্রভাব। উপন্যাসকে বলা হয় মানুষের আত্ম অনুসন্ধানের অভিযান; কিন্তু এই আত্ম অনুসন্ধান অভিযান শুধু উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরেই সীমাবদ্ধ নেই, ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরেও তা সংক্রামিত। বিশেষতঃ একালের ছোটগল্পে আখ্যানের বিস্তৃতি, চরিত্রের বহিরাঙ্গিক উপস্থিতির বদলে এই আত্ম অনুসন্ধান প্রবণতাই অধিক লক্ষ্যনীয়। এই প্রবণতা বিংশ শতকে এবং বিশেষভাবে বর্তমান শতকের বিগত কয়েক দশকে ও অতি সাম্প্রতিক কালে দৃষ্টিগ্রাহ্য। উল্লেখনীয় যে, উনিশ শতকেই কারো কারো রচনায় অর্থাৎ যাঁরা নিছক আখ্যান বর্ণনা নয়, বর্ণনার মধ্যে দিয়ে চরিত্রের মন ও মনের গভীরতর প্রদেশকে জানার বিশেষতঃ আত্ম অনুসন্ধান প্রবনতাকে তুলে ধরার কাজে বৃতী হয়েছিলেন এবং ছোটগল্পের আঙ্গিকে শিল্প সৃষ্টি উপহার দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের শীর্ষস্থানীয়। বিশ শতকের প্রথম পাদে ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক এবং কৌতুক রসাত্মক ছোটগল্পেও আপাত সরলতার অন্তরালে ছিল সেই আত্ম অনুসন্ধান প্রবণতা।

কবিতায় রবীন্দ্র রোমান্টিকতার বিরূদ্ধে যেমন তাঁর উত্তরসূরী কবিরা বিদ্রোহ ঘোষনা করেছিলেন, জীবনের অতিবাস্তবতা, নিরেট বস্তুরূপ এবং মনোবিকলন ও বিকৃতির স্বরূপ তুলে ধরে কবিতাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন, তেমনি কথাসাহিত্যে—বিশেষতঃ ছোটগল্পের ক্ষেত্রে ও রবীন্দ্র-রোমাণ্টিকতা এবং নির্ভাজ শুচি-শুভ্রতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সূচিত হয়েছিল। এই বিদ্রোহ-সূত্রেই কথাশিল্পে রোমাণ্টিক আতিশয্য এবং চিরায়ত মূল্যবোধের বদলে ভিন্নতর মূল্যবোধ ও জীবন চেতনা লক্ষণীয় হতে থাকে। মধ্যবিত্তের মানস-সংকট, জীবন,জটিলতা,

নিম্নবিত্ত নির্যাতিত মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা, কুৎসিৎ কদর্যতা গভীরতর সংস্থাপনে কল্লোল যুগের লেখকদের হাতে উদ্ভাসিত হয়েছে। গল্পের আখ্যানের চেয়ে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকেই যাঁদের ঝোঁক ছিল বেশী, তারা চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্য অনুসন্ধান ও অবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। কোথাও কোথাও বা তাদের নিজেদের মনস্তাত্ত্বিক ধারা কিংবা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চরিত্রের উপর আরোপিত হয়েছিল। স্মর্তব্য যে, এ-যুগের লেখকরা নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কার্যকারণ ও প্রয়োগজনিত প্রভাবকে তাদের রচনায় কাজে লাগাতে চেয়েছেন, ফলে চরিত্রের রূপবৈচিত্র্য ঘটেছে। এতকাল-ব্যাপী সমাজে যৌনতাবোধ কিংবা নারী পুরুষের পারস্পারিক শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে অনেকটা রক্ষণশীল ও স্থিতধী ধারণা বর্তমান ছিল, কিন্তু বিদেশী সাহিত্য ও অন্যান্য সামাজিক মূল্যবোধের বিবর্তনের প্রভাবে এসম্পর্কিত ধ্যানধারণাও পরিবর্তিত হতে থাকে। অবশ্য লক্ষ্যযোগ্য যে, সমাজ-মানসে এই পরিবর্তন যতটা না দৃষ্টিগ্রাহ্য ছিল, বিদেশী সাহিত্য ও ভাবধারার প্রভাবাধীন লেখকরা নিজেদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্যে তা ততটাই স্পষ্ট করে চিত্রিত করতেন। ফলে তাদের রচনায় স্বাভাবিকভাবেই এসব বিষয়ে কিছুটা অতিরেক দোষ প্রশ্রয় পেয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের নামে কেউ কেউ সে কাব্যোস্বাদের আমদানী করেছেন তা-ও স্বীকার্য। উল্লেখনীয় যে, চেতনাপ্রবাহরীতির অবলম্বনও কল্লোল-যুগের লেখকদেরই উদ্যোগের ফল। ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুসরণই যে এ-ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছিল তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখেনা। চেতনাপ্রবাহরীতির অণুসরণ হিসাবে মানস-কথন বাংলা ছোটগল্পে এবং উপন্যাসে বিদেশী-প্রভাবেই ঠাঁই করে নেয়। সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পে এ-রীতিটি ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে সত্য, কিন্তু এর প্রথম অনুশীলন আরম্ভ হয়েছিল কল্লোল-যুগের লেখকদের হাতেই।

॥ ২ ॥

বাংলা দেশের সাহিত্যে ছোটগল্পের আঙ্গিক, আন্তর প্রকৃতি এবং শিল্পরূপের স্বরূপ-সন্ধান ও এসবের মূল্যায়ন করতে হলে স্বভাবতই উপরোক্ত পর্যালোচনার অপেক্ষা রাখে, কারণ রচনার সমাজ-পটভূমি, উপজীব্যবিষয় এবং অনেকক্ষেত্রে চরিত্রসমূহ সমাজ-সত্তার প্রতীক হিসাবে

ভিন্ন হলেও, শিল্পের রূপরীতি এবং প্রকৃতিধর্মের দিক থেকে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের কথা শিল্পের ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকার ও এখানকার রচনায় বর্তিয়েছে। বাংলা দেশের কথা-সাহিত্যে—বিশেষতঃ ছোটগল্পে ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব যেমন ফলেছে, তেমনি পরোক্ষভাবে পশ্চিম বাংলার সাহিত্যের মাধ্যমেও ইউরোপীয় প্রভাব বর্তেছে। উপন্যাস কিংবা ছোটগল্পে বিদেশী-প্রভাব প্রধানতঃ এর আঙ্গিক, রূপরীতি এবং শিল্পপ্রকরণের প্রভাব। কেননা, কথা-সাহিত্য অনেকাংশেই সমাজ-নির্ভর হওয়ার দরুণ পটভূমির দিক থেকে এই বিশেষ শিল্পের সর্বজনীন হওয়া সম্ভব নয়। মানুষের আবেগ-অনুভূতি আশা আকাংখা, কামনা-বাসনা ও আর্তি-আকুলতার সার্বজনীন রূপ আছে, কিন্তু এসবের প্রকাশের কোনো সার্বজনীন রূপ নেই। চেতনা ও মনোভাবের দিক থেকে সব দেশের মানুষেরই এক এবং অভিন্ন হওয়া সম্ভব, যদিও শিক্ষার স্তর, জীবনমানের রূপ এবং সামগ্রিক সমাজ-প্রেক্ষিত ভিন্ন হওয়ার দরুণ সব সময় চেতনা ও মনোভাবের অভিন্নতা রূপ পায় না। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান, সমাজ-মানসের রূপ ও সমাজ-সংগঠন এখানকার মানুষকে স্বতন্ত্র প্রকৃতিধর্মে গড়ে তুলেছে। এই দেশ, জনজীবন ও সমাজ-মানসের রূপকার যে কথাশিল্‌পী তিনি যতই অগ্রসর চেতনার অধিকারী হোন না কেন, কথাসাহিত্যের আঙ্গিক-প্রকরণ এবং শিল্‌পশৈলীতে তার যতই দক্ষতা জন্মাক না কেন, সমাজ-বাস্তবতার অনুরোধেই তাঁকে সমাজ-নির্ভর হতে হয়, কাহিনীর প্রকৃতি এবং কাহিনীতে বিধৃত চরিত্রই তাঁর রচনার শিল্‌পরূপকে অনেক পরিমানে নিয়ন্ত্রিত করে। একারণেই দেখা যায়, বাংলাদেশের পূর্বসূরী লেখকরা সামাজিক উপাখ্যান সৃষ্টি এবং আলেখ্য রচনায় যতখানি শ্রম ও সাধনা ব্যয় করেছেন, তুলনায় ছোটগল্‌প রচনায় ততখানি আত্মনিবেদিত হন নি। নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা' এবং কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ্' উপন্যাসের আদলে সমাজচিত্র হিসাবে স্মরণীয়, কিন্তু মানুষের আত্ম-অনুসন্ধানের অভিযান যে উপন্যাস তেমন শিল্‌পলক্ষণ এসবে প্রগাঢ়রূপে বিধৃত নেই। উপন্যাসের ফুল অবশ্য একটি বিশেষ সমাজের পংকেই ফোটে, আর তারি মধ্যে দিয়ে সার্বজনীন মানুষের সৌরভ বিকশিত হয়। মুখ্যত সমাজের বহিরাঙ্গিক রূপ, এবং গৌণতঃ অন্তস্থ্য আবেগ-আকাংখা রূপায়িত হওয়ার দরুণ উল্লেখিত

শিল্পসৃষ্টিতে গভীরগামিতার ন্যূনতা লক্ষ্যণীয়। শিল্পসৃষ্টির চেয়ে সমাজকল্যাণ কামিতার আকাংখা রচয়িতাদের মনে ঐতিহাসিক-সামাজিক কারণেই অধিক প্রশ্রয় পেয়েছিল, সম্ভবতঃ একারণেই ছোটগল্পের আঙ্গিক অবলম্বন না করে তাঁরা উপন্যাসের বৃহত্তর পট খুঁজে নিয়েছিলেন। স্মর্তব্য, উপজীব্য বিষয়ের বিশেষ প্রকৃতি, রচয়িতার মানস-গঠন এবং শিল্প-মাধ্যমের উপর অধিকারের প্রকৃতিভেদে উপন্যাসও ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত হতে পারে, আবার অনুরূপ কারণে ছোটগল্পেরও উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত হওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর 'লাল সালু' উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত হলেও, আঙ্গিক-প্রকরণ এবং রচনারীতির দিক থেকে এই শিল্পকর্ম অনেকাংশে ছোটগলপেরই লক্ষাণাক্রান্ত। অন্যদিকে, জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' কিংবা আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান' পরিসরে ছোটগল্পের আদলপ্রাপ্ত হলেও, প্রকৃতিধর্মে একান্তরূপেই উপন্যাস। উদাহরণ হিসাবে দুটি গ্রন্থের উল্লেখ করা হল। পুর্বসূরী কথাশিল্পীদের মধ্যে উপন্যাসের ছোটগল্পের চরিত্র অর্জন, অথবা ছোটগল্পের উপন্যাসের চরিত্র-লক্ষণাক্রান্ত হওয়ার উদাহরণ হিসাবে আবুল ফজলের 'জীবনপথের যাত্রী' গ্রন্থটির উল্লেখ করা যায়। আমাদের সাহিত্যে একালের অনেক উপন্যাসই যেমন ছোটগল্পের চারিত্র্য-লক্ষণাক্রান্ত, তেমনি অনেক ছোটগল্পেও উপন্যাসের সম্ভবনা অন্তর্গত। এর অনুভবযোগ্য কারণ, বৃহত্তর সমাজ-জীবনে ব্যাপক পটভূমির সাথে লেখকের অন্তরঙ্গ পরিচয়ের এবং অন্তর্দৃষ্টির অভাব, অন্যপক্ষে বৃহত্তর সমাজ-মানসের আত্ম-অনুসন্ধান-অভিযানের বদলে চরিত্রের মনকে জানার অভিপ্রায়। উপন্যাস এবং ছোটপল্প কোনো না কোনো কাহিনী বা আখ্যানের অপেক্ষা রাখে। যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে, যে-আখ্যায়িকা সামগ্রিকতার ছন্দে আচরিত তা-ই উপন্যাস, এবং অন্যপক্ষে যা খণ্ডাংশের ছন্দে আচরিক তা-ই ছোটগল্প। যেহেতু ছোটগল্পে আখ্যায়িকা খণ্ডাংশের ছন্দে আচরিত সে-কারণে বাংলাদেশের একালের কথাশিল্পীদের প্রয়াস প্রধানতঃ ছোটগল্প রচনার দিকেই নিবেদিত। উল্লেখনীয় যে, উপন্যাস এবং উপন্যাসোপম বড় গল্প যারা রচনা করেছেন তাঁদের হাতেও আখ্যায়িকা খণ্ডাংশের ছন্দেই আচারিত হয়েছে। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্, শওকত ওসমান, শামসুদ্দীন আবুল কালাম অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর পটভুমিতে উপন্যাস রচনা করেছেন। সৈয়দ

ওয়ালিউল্লাহ্‌র 'লাল সালু' চাঁদের অমাবস্যা' 'কাঁদো নদী কাঁদো' শওকত ওসমানের 'জননী' শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' ইত্যাদি রচনায় বাংলাদেশের বৃহত্তর সমাজ-পটভূমি এবং গ্রামীন জীবন বিধৃত হয়েছে। যদিও সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর রচনায় প্রথাগতরীতির আখ্যান-আখ্যায়িকা বর্ণনার বদলে চরিত্রের মন এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিকেই ঝোঁক পড়েছে বেশী। চেতনাপ্রবাহরীতির অনুসারী হওয়ার দরুণ, শুধু উপন্যাসে নয়, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর ছোটগল্পে ও এ-লক্ষণের প্রাধান্য। শওকত ওসমান, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, শাহেদ আলী প্রমুখের রচনায়ও গ্রাম-বাংলার বৃহত্তর সমাজ-পটভূমি—বিশেষতঃ মুসলিম সমাজ-পটভূমি নানাভাবে রূপায়িত। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর মতো এঁরা কেউই চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের দিকে ঝুঁকেননি, অনুসরণ করেননি আধুনিক চেতনাপ্রবাহরীতি। এঁরা প্রধানতঃ আখ্যায়িকার আদলে গল্প গড়ে তুলেছেন। বাস্তব জীবন-অভিজ্ঞতা, সামাজিক সমস্যা, সংস্কার আবিলতা, নর-নারীর স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা, দৈনন্দিন-জীবন-সংগ্রাম ইত্যাদিই এঁদের রচনার উপজীব্য। শামসুদ্দীন আবুল কালাম যেখানে বাস্তব জীবনের সাথে রোমান্টিকতার সংমিশ্রন ঘটিয়েছেন, গড়ে তুলেছেন রোমান্টিক পরিবেশ ও পটভূমি, সেখানে শওকত ওসমান রূপায়িত করেছেন সামাজিক অসাম্য, ভেদ-বৈষম্য, শ্রেণী-দ্বন্দ্ব, সংস্কার-আবিলতা ইত্যাদি। শামসুদ্দীন আবুল কালামের রচনায় প্রধানতঃ বাস্তব জীবন সমস্যার পটে রোমাটিকতা প্রশ্রয় পেলেও তাঁর পরবর্তী রচনায় যুদ্ধোত্তর যুগের স্খলন-পতন, মূল্যবোধের বিবর্তন, জীবন চেতনার পরিবর্তন-জনিত মানস সজাগতা এবং বক্তব্য রূপ পেয়েছে। নগরজীবন কেন্দ্রিক রচনায় শওকত ওসমান আলোখ্য রচনার বদলে বিশেষ ধর্মিতার দিকে ঝুকেছে, ফলে সে সব রচনায় সারল্যের জায়গায় প্রতীকধর্মিতা প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজ সচেতন শিল্পী হিসাবে শওকত ওসমান তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে সমাজ আলেখ্য রচনা এবং তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ প্রকাশ করেছেন। শিল্পকর্মের মধ্যদিয়ে এই সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব বোধ প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি কোথাও কোথাও হয়ে উঠেছেন বড় বেশী উচ্চকন্ঠ, ফলে সর্বত্র শৈল্পিক নির্লিপ্ততা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। গ্রাম বাংলার নিজস্বপটে ও স্বতন্ত্র মুসলিম পরিবেশে জীবন-চিত্রনের শৈল্পিক-প্রয়াস রয়েছে শাহেদ আলীর

রচনায়। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো শুধু ব্যবহারিক জীবন-পরিচয়ের দিক থেকেই স্বতন্ত্র নয়, চিন্তা ও চেতনার দিক থেকেও স্বাতন্ত্র্যধর্মী। মুসলিম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধ্যান-ধারণা ও জীবনরূপের অভিব্যক্তি ঘটাতে গিয়ে তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে রূপক ও প্রতীক ব্যবহার করেছেন। তাঁর হাতে রচনার ভাব যেমন ইন্দ্রিয়ঘন, কবিত্বময় ও আমেজধর্মী হয়ে উঠেছে, তেমনি চরিত্রগুলো ফুটে উঠেছে রোমান্সরূপ নিয়ে। কিন্তু তাঁর সীমাবদ্ধতা এইখানে যে তাঁর, রচনার উপজীব্য-বিষয়ের এলাকা খুবই সংকীর্ণ. সমাজ-জীবন ও সমাজ-মানসের পরিবর্তন, জীবন-সমস্যার টানাপোড়েন এবং সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের ভাঙাগড়ার প্রতিফলন তাতে প্রায়ই অনুপস্থিত। আবু রুশদ প্রধানতঃ উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং চাকুরেজীবীদের ঘরোয়া পরিবেশ থেকে উপজীব্য বিষয় এবং চরিত্রের আদর্শ আদল সংগ্রহ করেছেন। তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পই বস্তুতঃ রোমন্টিক আখ্যান। গভীর জীবনানুভূতি, অন্তর্দৃষ্টি ও প্রাগ্রসর শিল্পচেতনার অভাবে আবু রুশদ-এর মুসলিম উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনাভিত্তিক রোমান্টিক কাহিনীও তেমন বিশেষ অভিব্যঞ্জনা লাভ করেনি। মবিনউদ্দিন আহমদের রচনায় শিল্পরীতির দিক থেকে কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় মেলে। ছোটগল্পে তিনি প্রধানতঃ বনফুলের অনুসারী। সামান্য দুয়েকটি কথার আঁচড়ে তিনি গল্পের মর্মোদ্ঘাটন ও রস-সঞ্চারে পারদর্শী। তাঁর এসব রচনায় কোথাও সমাজ-চিত্র অংকিত, কোথাও বা চরিত্রের মন উদ্ঘাটিত। কিন্তু তাঁরও সীমাবদ্ধতা এইখানে যে, পরিবর্তনশীল সমাজ-প্রেক্ষিত ও সমাজ-মানসের পরিচয় তাঁর রচনায় বিধৃত নয়।

সরদার জয়েননউদ্দীন, আলাউদ্‌দিন আল-আজাদ, মির্‌যা আ-মু-আবদুল হাই, আবদুল গাফফার চৌধুরী প্রমুখের ছোটগল্প প্রধানতঃ বাংলাদেশের গ্রাম-জীবন ও মুসলিম সমাজ পরিবেশকে উপজীব্য করে রচিত। অবশ্য এঁদের রচনায় মধ্যবিত্তের জীবন-সমস্যা, সংকট ও নাগরিক জীবন-জটিলতার পরিচয়ও রূপ পেয়েছে। সামাজিক জীবনের অসাম্য, ভেদ-বৈষম্য পরিবর্তমান সমাজ-সত্তা ও তার পটে বিধৃত নর-নারীর সম্পর্ক সরদার জয়েনউদ্‌দীনের রচনায় রূপায়িত। গণজীবনের আশা-আকাংখা, দুঃখ-বেদনা ও আতি অকুন্ঠতা তাঁর রচনাও প্রতিফলিত, কিন্তু এ-সবের শৈল্পিক রূপায়নে তিনি আখ্যায়িকা সৃষ্টির দিকেই অধিক মনোযোগী, চরিত্রের ভাবনা-অনুভাবনা এবং চিন্তা-চেতনাকে সূক্ষ্মতর

বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার দিকে তাঁর প্রবণতা নয়। ছোটগল্পের শিল্পরীতির দিক থেকে তিনি প্রথাগতরীতির অনুসারী। আলাউদ্দিন-আল আজাদের ছোটগল্পে গ্রাম ও শহরজীবনের আলোখ্য রূপায়িত হয়েছে। গ্রামীন মানুষের জীবন সংগ্রাম বেঁচে থাকার আকাংখা, নবজাগ্রত সংগ্রামী চেতনা এবং নরনারীর প্রেম-বিরহ ভালোবাসার কাহিনী অনেকটা প্রথাগতরীতি এবং ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধারায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। দেশজ পটভূমিকায় রচিত এসব গল্প আলাউদ্দিন-আল-আজাদের হাতে দেশজরীতিতেই গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ এসব গল্পে উপজীব্য বিষয় সংগ্রহে তিনি যেমন স্বদেশের এবং বিশেষভাবে গ্রামজীবনের পটে বিচরণ করেছেন, তেমনি চরিত্রসৃষ্টিতেও কোনরূপ আরোপিত বৈশিষ্ট্যের অন্বেষী হননি। ফলে তাঁর ছোটগল্পে সমাজের বাস্তব ও অন্তরঙ্গ পরিচয়ই বিধৃত হয়েছে। তাঁর প্রথম দিককার রচনায় উপজীব্য বিষয় ও চরিত্রের সাথে গভীর ও নিবিড় পরিচয় আন্তরিকতায় অভিব্যক্ত। গ্রাম-জীবনের পটভূমিকায় তিনি যেমন সংগ্রামী মানুষের পরিচয় তুলে ধরেছেন, তেমনি শহুরে পটভূমিকায়ও রূপায়িত করেছেন নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর সংগ্রামী জীবনের পরিচয়। কিন্তু পরবর্তী রচনায় আলাউদ্দিন-আল আজাদ এই অন্তরঙ্গতা ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারেননি। আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে অনেকক্ষেত্রে অবাস্তবতা এবং অতিরেক দোষকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। ফলে আধুনিক জীবন-সমস্যা ও মানসিক-দ্বন্দ্বের রূপায়ন তাঁর হাতে স্বাভাবিকভাবে ঘটেনি। এসব রচনায় তিনি মানসিক-দ্বন্দ্ব ও মনোবিকলাঙ্গের নামে অমিতচার ও অবাস্তবতাকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন। গল্পরচনায় মির্যা আ-মু-আবদুল হাইয়ের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি তাঁর চরিত্রগুলোকে আমাদের দেশীয় সমাজ-পরিবেশ থেকেই তুলে আনেন। বিশেষতঃ গ্রামজীবন, ভিত্তিক রচনায় পরিবেশ বর্ণনা চরিত্রের ব্যবহার রীতি, জীবনধারা বাংলাদেশের বৃহত্তর জনজীবনেরই প্রতিনিধিত্ব করে। রচনার আঙ্গিকগত দিক থেকে তাঁর রচনা কিছুটা প্রথাগতরীতির অনুসারী; আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে তিনি তাঁর রচনায় কোনোরূপ অতিরেকদোষকে প্রশ্রয় দেন নি।

আধুনিক সমাজচিত্র অংকনের নামে বিদেশী রূপরীতির অনুসরণ এবং চরিত্রের অনুকরণ তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায়না। জীবনের বিভিন্ন

এলাকা থেকে ও পরিসর থেকে আ, মু, আব্দুল হাই চরিত্র তুলে আনেন, এবং তাকে স্বদেশীয় সমাজ-পটভূমিতে সংস্থাপিত করেন। মনোবিশ্লেষণের দিকে; এবং চরিত্র চিত্রায়নে তাঁর প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও, তাঁর রচনায় ভিত্তি হিসাবে প্রায়শই একটি আখ্যায়িকা অবলম্বিত হয়। আখ্যায়িকাহীন মনোকথন কিংবা নিছক মনোবিশ্লেষণ তাঁর রচনার চারিত্র্যলক্ষন নয়। ছোটগল্পের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষনের দিকে তাঁর সচেতনতা লক্ষ্য করা গেলেও, কোনো কোনো রচনায় আঙ্গিকগত শৈথিল্যও প্রশ্রয় পেয়েছে, ফলে সে সব রচনা হয়ে উঠেছে কিছুটা বিস্তারধর্মী এবং উপন্যাসের চরিত্র লক্ষনাক্রান্ত। আবদুল গাফফার চৌধুরী তাঁর ছোটগল্পে গ্রাম জীবন ও নগর জীবন—উভয় জীবনকেই উপজীব্য হিসাবে গ্রহন করেছেন। যে সব গল্পে তিনি গ্রাম জীবনের পটভূমিকায় চরিত্রের রূপায়ন ঘটিয়েছেন সে ক্ষেত্রে চরিত্র, গুলো নিজস্ব সমাজ পরিবেশে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি অনেকটা সহজ স্বাভাবিকতায় বিকশিত; এ-কারনেই উপজীব্য বিষয় ও বক্তব্যকে তিনি কোনো বিশেষ চেতনা কিংবা ভাবাদশের রংগে অনুরঞ্জিত করেননি, বজায় রেখেছেন কিছুটা নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী। গ্রামীন জীবন ও সমাজ-পটভূমিকা—কেন্দ্রিক ছোট গল্প ও উপন্যাস রচনায় গাফফায় চৌধুরী অনেক ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের তার অনুসারী—রচনারীতি ও চরিত্র চিত্রন উভয় দিক থেকেই। তাঁর গ্রামীন এবং শহুরে উভয় জীবন ভিত্তিক রচনাতেই অনুভবে এবং বর্ণনারীতিতে রোমানণ্টিকতার প্রশ্রয় আছে। বস্তুতঃ বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে তাঁর রচনায় হৃদয়বৃত্তিরই প্রাধান্য বেশী। তাঁর আধুনিক শহুরে জীবন ও জীবন সমস্যা কেন্দ্রিক রচনায় তিনি মধ্যবিত্ত ও নিন্ম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিক দ্বন্দ্ব ও মানবিক সম্পর্কের রূপকার।

ছোট গল্প রচনার প্রথাগতরীতি ও ঐতিহ্যাশ্রয়ী ধারা—অর্থাৎ গল্পে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি কাহিনী বা আখ্যায়িকার বিস্তার, সাম্প্রতিক কথাশিল্পীদের হাতে খুব কমই অনুসৃত হচ্ছে। একালের ছোট গল্পকারদের মধ্যে যারা কাহিনীর অবলম্বনকে একেবারে পরিত্যাগ করেননি তারাও কাহিনীর বা আখ্যায়িকার উপর গুরুত্ব আরোপের বদলে চরিত্রের মনোবিশ্লেষন এবং তার অন্তঃস্থ্য আবেগ—অনুভূতি কিংবা ভাবনাবিষদের উসাবদনের দিকেই অধিক ঝুঁকেছেন। প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত মানস এবং শহুরে জীবন জটিলতার রূপকার কথাশিল্পীরা সামাজিক ও ব্যক্তিগত মানসেয়

দ্বন্দ্ব, পারিবারিক জীবনের সংকট, বিভ্রান্তি, বিষাদ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মানসিক বিকৃতি ও মনোবিকলনের ছবি ফুটিয়ে তুলতে আগ্রহী। আধুনিক আঙ্গিক ও রূপরীতির অনুসরণে গল্প রচনায় যাঁরা পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন তাদের মধ্যে হাসান হাফিজুর রহমানের রচনায় মানবিকতা ও মননধর্মিতার পরিচয় দীপ্ত। গ্রামীন ও নগর জীবন—উভয়ই তার রচনার উপজীব্য। তাঁর রচনায় আখ্যায়িকার অংশ অনুপস্থিত নয়, কিন্তু মানস-সংকট, সামাজিক ও মানসিক সমস্যা তুলে ধরা এবং মনোবিশ্লেষনের দিকেই তার প্রবণতা। কাহিনী এবং আখ্যানের আশ্রয় নিলেও, চরিত্র চিত্রায়ন এবং চরিত্রের অনুভূতির গভীর প্রদেশ আলেকিত করাই তাঁর শিল্প অন্বেষা। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর গল্প গড়ে তোলায় প্রধানতঃ প্রথাগতরীতি ও কাহিনী-সংগঠনের ঐতিহ্য অনুসরণ করেন না। তিনি চরিত্রের মানসরূপ ও গল্পের বক্তব্য তুলে ধরতে গিয়ে ইঙ্গিত ও রূপককেই অবলম্বন করেন। ফলে তাঁর রচনায় চরিত্রের সামগ্রিক রূপ ধরা দেয়না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জটিল মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ ও দ্বান্দ্বিক রূপ উদ্ভাবনেই গল্প সমাপ্ত হয়ে যায়। বৃহত্তর সমাজ জীবনের তুলনায় পারিবারিক ও ব্যক্তি জীবনের দ্বন্দ্ব, সংকট, ত্রিকোন প্রেম, প্রেমজাত সমস্যা ও সংকট, বেদনা বিষাদ ও অস্থিরতাই তাঁর রচনায় প্রধানতঃ বিধৃত। তিনি চরিত্রের মন ও মানস-সংকটের ওপর যতখানি গুরুত্ব আরোপ করেন, সমাজ পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারটিকে ততখানি গুরুত্ব দেন না। ফলে গল্পের ঘটনা ও চরিত্র অনেকক্ষেত্রে একান্তরূপে পরিবেশ নিরপেক্ষ হয়ে ওঠে। আখ্যানের ওপর গুরুত্ব দেননা বলে তাঁর ছোটগল্প অনেক সময় ব্যক্তিগত প্রবন্ধের লক্ষণাক্রান্ত বলে মনে হয়। সৈয়দ শামসুল হকের ছোটগল্পে ঐতিহ্যগত ধরার সঙ্গে নতুন নিরীক্ষার একটা সমন্বয় প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। উপন্যাসে কোথাও কোথাও তিনি আঙ্গিকগত পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে জটিলতা-আশ্রয়ী হয়েছেন, কিন্তু ছোটগল্পে এ লক্ষণ তেমন বিধৃত নেই। তাঁর গল্পের ভাষা অপেক্ষাকৃত সাবলীল এবং রোমাণ্টিক। তাঁর উপন্যাসে যেমন তেমনি ছোটগল্পে তিনি সাম্প্রতিক কালে বিশেষ ভাবে দেশজ পটভূমিতে ফিরে এসেছেন, নিজস্ব পরিবেশ প্রতীক ও রূপকের মধ্য দিয়ে গল্প ফুটিয়ে তোলার দিকে ঝুঁকেছেন। জহির রায়হানের ছোটগল্পে নিজস্ব সমাজের বাস্তব পটভূমি অধিক জীবন্ত। উপন্যাসে তিনি বৃহত্তর গ্রামজীবন অবলম্বন করেছেন, কিন্তু ছোটগল্প

রচনায় তিনি অনেকাংশেই শহুরে জীবনের রূপকার। তাঁর ছোটগল্‌পে কি কাহিনী সংগঠনে কি বর্ননারীতিতে রোমান্টিক মানস প্রবণতার আতিশয্য লক্ষ্যনীয় নয়। একজন সামাজসচেতন ও জীবন -সমস্যার রূপকার শিল্‌পী হিসাবে তিনি অন্তদৃষ্টির আলোকে সামাজিক ও মানবিক সমস্যাগুলো তুলে ধরতে প্রয়াসী। তাঁর রচনারীতিতে বর্ননার আতিশয্য প্রশ্রয় পায়নি, প্রশ্রয় পায়নি মনোবিশ্লেষনের অকারন ঝোক, কিছুটা রেখাচিত্র এবং কোথাও কোথাও স্কেচ রূপে তিনি গল্‌পের কাঠামো গড়ে তুলেছেন।

আধুনিক জীবন-সমস্যা ও জীবন জটিলতার রূপকার হওয়া সত্ত্বেও শওকত আলী তাঁর গল্পে কাহিনীভাগকে একেবারে বিসর্জন দিয়ে শুধু বক্তব্য উপস্থাপন কিংবা মনোবিশ্লেষণকেই একছত্র আধিপত্য দেননি। তিনি রচনায় কাহিনী-ভাগ ও বক্তব্যবিষয়ের সুষম রূপ তুলে ধরতে চেয়েছেন। চরিত্রের মানসরূপ ও দ্বন্দ্বের পরিচয় তাঁর হাতে অভিব্যক্তি পেয়েছে কিছুটা সুবিন্যস্ত ও সুমিতরূপে। ফলে কোথাও কোথাও তাঁর গল্প বড় বেশি সাজানো-গোছানো, সুবিন্যস্ত ও শিল্প-সুমিত বলে মনে হয়। তাঁর গল্পের ভাষা রোমাণ্টিকতা মণ্ডিত কিংবা আবেগাশ্রিত নয়, মননশীল। ভাষার এই মননশীলতা গল্পের চরিত্রের অভিব্যক্তিকেও প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়। ফলে গল্পের চরিত্র সর্বত্র স্বাভাবিকতায় বিকশিত হয়নি, রচয়িতার মানস সৃষ্টি হিসাবেই উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর রচনায় সমরেশ বসুর—বিশেষতঃ তাঁর আদিবাসী ও সাঁওতালদের জীবনকেন্দ্রিক রচনার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। কিন্তু তাঁর সীমাবদ্ধতা এইখানে যে, কাহিনী-সংগঠন ও উপজীব্য বিষয়ের আহরণে তিনি দেশজ পটভূমি ও স্ব-সমাজের দিকে বেশি ফিরে তাকাননি, অনেকক্ষেত্রে বিদেশী আদর্শ ও আদলকেই অনুসরণ করেছেন। বিশেষভাবে তাঁর উপন্যাসে এ-সীমাবদ্ধতা লক্ষ্যণীয়। হাসান আজিজুল হক রচনা-রীতি, আঙ্গিক প্রকরণ ও জীবনানুভূতিতে আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রচনায় নিজস্ব সমাজ-পরিবেশ ও দেশজ পটভূমি অধিকতর উজ্জ্বল। নিছক কাহিনী-বর্ণনা কিংবা চরিত্র-চিত্রায়ন তাঁরও লক্ষ্য নয়, কাহিনী এবং আখ্যায়িকার আদলে তিনিও চরিত্রের মন, অন্ত্যস্থ আবেগ, ভাবনা-বিষাদ এবং মানস-সংকট ফুটিয়ে তুলেছেন, সন্ধানী দৃষ্টি মেলে এসবের গভীরে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু তাঁর গল্‌পের চরিত্র এবং কাহিনী কাঠামো অধিকাংশক্ষেত্রে সংস্থাপিত হয়েছে দেশজ পটভূমিতে, নিজস্ব

সমাজ পরিবেশে। গল্পে প্রতীক এবং রূপকের আশ্রয় হাসান আজিজুল হকও গ্রহণ করেছেন; কোনো কোনো রচনায় তিনি প্রতীকধর্মী চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রাগ্রসর মানসও সমাজচেতনা হাসান আজিজুল হকের রচনায় মননধর্মী বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত। মননশীলতাকে প্রশ্রয় দিলেও নিছক বুদ্ধিবৃত্তিকেই তিনি অবলম্বন করেননি. হৃদয়বৃত্তিকেও ছাড়পত্র দিয়েছেন। জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের রচনায় বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির সমন্বয় লক্ষ্যণীয়। আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি কোনো কোনো গল্পে জটিলতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন সত্য, কিন্তু তাঁর গল্পে সর্বত্রই এই প্রবণতা মাথা উঁচিয়ে নেই। গল্প-নির্মান কিংবা আখ্যানভাগ রচনায় তিনি প্রথাগত রীতির অনুসরণ করেন নি, কিন্তু এ-সত্ত্বেও তাঁর রচনায় গল্পভাগ একেবারে বিসর্জিত নয়। তিনি ও পরিচিত পরিবেশ এবং চেনা-জানা জগৎ থেকে গল্প ও গল্পের চরিত্র আহরণ করেন এবং নিজস্ব চেতনা ও অনুভূতির রঙ্গে অনুরঞ্জিত করে তোলেন। হুমায়ুন কাদির, মাহবুব তালুকদার, বুলবন ওসমান, মীর আবুল হোসেন—এরা গল্পের আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে তেমন ব্যাপৃত নন। হুমায়ুন কাদিরের রচনায় কি বর্ণনায় কি উপজীব্যবিষয় আহরণে রোমাণ্টিকতার প্রশ্রয় আছে। সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা-সংকট, রোমান্টিক আর্তি-আকুলতা, প্রেম-ভালোবাসা এবং তজ্জনিত রোমাণ্টিক নৈরাশ্যবোধ তাঁর রচনায় রূপ পেয়েছে। মাহবুব তালুকদারের রচনায়ও এই রোমাণ্টিক-মানস চেতনারই প্রাধান্য। অবশ্য কোন কোনো রচনায় তিনি সামাজিক ভেদ-বৈষম্য, সমস্যা-সংকট এবং মূল্যবোধের বিপর্যয়কে তির্যক দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলেছেন, কিছুটা ব্যঙ্গবিদ্রূপের কশাঘাত হেনেছেন। মূলতঃ রোমাণ্টিক মানস-প্রবণতার অধিকারী হলেও বুলবুল ওসমান সামাজিক, মানবিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা-সংকটকে গল্পে রূপায়িত করেছেন, কখনো ব্যঙ্গে কখনো বিদ্রূপে সামাজিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য সংস্কারকে চাবুক হেনেছেন। এসব রচনায় তিনি কিছুটা স্কেচ বা নকসার আঙ্গিক অবলম্বন করেছেন।

।। ৩ ।।

সাম্প্রতিক কালের ছোটগল্পে চেতনাপ্রবাহরীতির অনুসরণ এবং মনোকথন একটি প্রধান প্রবণতা হিসাবে দৃষ্টগ্রাহ্য। একালের গল্প

লেখক চরিত্রের চেয়ে চরিত্রের মন, তার ভাবনা বেদনা ও অতল নৈরাশ্য-বোধকে ফুটিয়ে তুলতে চান, চরিত্রের মনের জটিল অন্ধিসন্ধি এবং জটিল মনোগ্রন্থী উন্মোচন করে তার মনোবিকলন ও বিকৃতিকে শিল্পরূপে ফুটিয়ে তুলতে চান। তাই গল্পে আখ্যায়িকা গড়ে তোলা কিংবা আদৌ কোনো আখ্যায়িকার আশ্রয় না নেওয়া, এর কোনটিই গল্পকারের জন্যে আর অপরিহার্যরূপে জরুরী নয়। বিশেষতঃ নগর জীবনের সমস্যা সংকট, বেদনা বিষাদ, হতাশা ও নৈরাশ্য, চারিত্রিক স্খলন পতন ইত্যাদির চিত্র ঠিক চিত্ররূপে ফুটিয়ে না তুলে কখনো মনোকথনের আশ্রয়ে, কখনো বা আত্মকথনের ভঙ্গীতে উপস্থাপিত করাই একালের কোনো কোনো গল্পকারের প্রবণতা। যে-কোন উপায়ে আখ্যানভাগ গড়ে তোলা গল্পের জন্যে অবশ্যই জরুরী নয়, কিন্তু আখ্যানভাগ গড়ে তুলতে হলে যে-অন্তদৃষ্টি এবং সৃজনী প্রতিভা দরকার তা-সব গল্কারেরই আয়ত্তে নয়, সম্ভবতঃ এ-কারণেও একালের ছোটগল্পে ব্যাক্তিগত ভাবনা-অনুভাবনা এবং বেদনা বিলাসের এমন প্রাধান্য। অধিকন্তু একালের ছোটগল্পে কবিতার প্রভাব সংক্রামিত স্বাক্ষরিত হওয়ার দরুণ, ছোটগল্প অনেকক্ষেত্রেই কবিতার চারিত্র্যধর্ম অর্জন করেছে। আবদুল মান্নান সৈয়দের ছোটগল্পে কবিতার এই সংক্রামণ এবং চেতনা প্রবাহ-রীতির অনুসরণ লক্ষ্যযোগ্য। গল্পে মান্নান সৈয়দ সর্বত্র কাহিনী আশ্রয়ী নন, চরিত্রের মনোগহনের সংবাদ এবং ভাবনা-বেদনা ও বিভ্রান্তি বিস্তৃতি তিনি কাব্যসম্মত বর্ণনা এবং উপমা—উৎপ্রেক্ষার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন, তাঁর গল্পে এর মধ্যে দিয়েই রূপ পায় চরিত্রের হতশা-নৈরাশ্যবোধ, কোথাও কোথাও তিনি রূপক এবং প্রতীকের সাহায্যে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলেন বক্তব্যবিষয় ও ভাবনা—অনুভাবনাকে। মনোবিশ্লেষণ তাঁর গল্পকে কিছুটা ক্লান্তিকর করে তুললেও বর্ণনারীতির সৃষ্টিধর্মিতা এবং উপমা—উৎপ্রেক্ষার প্রাণসত্তা পাঠককে উপভোগ্য আনন্দের স্বাদ দেয়। মান্নান সৈয়দের সব গল্পই অবশ্য উল্লিখিত রূপরীতির নয়, যেখানে তিনি সমাজচিত্র অংকন করেছেন সেখানে তাঁর রচনা অপেক্ষাকৃত সরল এবং প্রথাসিদ্ধ। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এবং সায্‌যাদ কাদিরের রচনায় ও চেতনা প্রবাহরীতি অনুসরণ এবং মনোকথনের ভঙ্গী অনুসৃত।

॥ ৪ ॥

আমাদের ছোটগল্পে সামাজিক সমস্যা, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব সংকট ও মানবিক মূল্যবোধের চিত্র যতখানি রূপায়িত হয়েছে, তুলনায় রাজনৈতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও ঘাত-প্রতিঘাত এবং তার অভিঘাতে জাগ্রত চেতনাবোধের স্বাক্ষর তেমন বিধৃত হয়নি, এমন কি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সমাজ জাগৃতির আলোখ্য হিসাবেও তা তেমন ধরা পড়েনি। দেশবিভাগ, ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, উনসত্তুরের ঐতিহাসিক গণ জাগরণ এবং একাত্তুরের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের কাব্য সাহিত্যে যতখানি প্রতিফলিত হয়েছে, অন্যবিধ গদ্যরচনায় স্বাক্ষর রেখেছে, তুলনায় উপন্যাসে কি ছোটগল্পে তেমন রেখাপাত করেনি। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক ছোটগল্পের সংখ্যা খুবই নগন্য, উনসত্তুরের উত্তাল গণজাগরণ ও উল্লেখনীয়রূপে বিধৃত নয়, একাত্তুরের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং বর্বর পাক বাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞকে উপজীব্য করে লেখা সৃজনধর্মী ছোটগল্পের সংখ্যাও হাতে গোনার মতো। তবু আশা, স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলিয়ে ওঠে স্বাধীন স্বদেশে আমাদের কথাশিল্পীরা হয়তো আগামীতে এইসব অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা ও বৃহত্তর সমাজমানসের আশা আকাংখা বেদনা·বিষাদ ও বিপর্যয়ের সৃষ্টিধর্মী রূপচিত্র উপহার দেবেন।

—মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌

বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যের ধারা ও সমস্যা

দেশভাগ হওয়ার পর বাংলাদেশের (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) সাহিত্যের প্রকৃতি ও গতি কী হবে অথবা কী হওয়া উচিত এরকম প্রশ্ন উঠেছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যেখান থেকে স্পষ্টরূপ লাভ করে সেই মধ্যযুগের সাহিত্য একদিকে ছিল কবিতাশ্রয়ী আর সেখানে সাহিত্যের মানবিক দিকগুলো ধর্মকে অবলম্বন করেই বিকাশ লাভ করেছে ও ব্যস্ত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ইংরেজ আগমনের সময় থেকে এদেশে গদ্যসাহিত্যের সঠিক অর্থে আবির্ভাব হয়। সংবাদপত্রের প্রকাশ ও পাশ্চাত্য ভাব ধারার প্রভাব এদেশের গদ্যসাহিত্যের ভাণ্ডারকে পুষ্ট করতে শুরু করে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের ক্ষেত্রে সাহিত্যের শিল্পরূপের সর্বাধুনিক আয়োজন উপন্যাস সাহিত্য গড়ে ওঠে।

সামন্তবাদী সমাজে যেখানে ধর্মীয় আচারবিধি ও সামন্ত মূল্যবোধ প্রবল বেগে প্রবাহিত ও সমাজের সর্বস্তরে অনুভূত হয় সেখানে সামাজিক ধ্যান ধারণা ও আশা আকাঙখার ধর্মীয় পরিমণ্ডল দৃশ্যতঃ প্রধান স্থান অধিকার করে থাকে। এ কারণেই বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের চরিত্র ও বিচরণক্ষেত্র একটি মাত্র সম্প্রদায়ের আশা আকাঙখা, ভাবনা-চিন্তা ব্যথা বেদনার বহিঃপ্রকাশ অনেকখানি সীমিত ছিল। পরবর্তী সময়ে আধুনিক শিক্ষার প্রভাব ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব সমাজের সর্বস্তরে গভীর অনুপ্রবেশের ফলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষও উপন্যাসের চরিত্রে ভীড় করেছে, এভাবেই মধ্যযুগীয় ধর্মীয় গণ্ডীর ক্ষিয়মান দিগন্তে সত্যিকার অর্থে আমরা সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের কাহিনী, তাদের জীবনধারার সীমিত উপকরণ সত্বেও এক বহির্মুখী

মানসের প্রচণ্ডতা অবলোকন করি। এই মানসিকতা সামন্তবাদের গণ্ডী উপচিয়ে নতুন মূল্যবোধে উচ্ছিত।

বুর্জোয়াযুগের শিল্পরূপের এ নতুন ধারা – উপন্যাস সাহিত্য মূল্যবোধের ক্ষেত্রে নতুন আয়োজন এনেছে, তা আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভাবাকাশকে আশ্রয় করে যতটা প্রকাশিত, সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানবিক সম্পর্কের পরিবর্তনের বিষয়-নিরপেক্ষ ও বিষয়মুখীন দ্বৈতসত্তার দ্বান্দ্বিক ঐক্যশ্রায়ী ত্যাগ নয়। এজন্যই সম্প্রদায়গত ভেদরূপটি বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের প্রথমযুগে এত বেশী উপস্থিত। অর্থাৎ সমাজের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঠিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য রূপায়নের ক্ষেত্রে সমাজ অন্তর্গত মানুষের শ্রেণী ভিত্তিক রূপটির একাংশই আলোকিত হয়েছে।

সামাজিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র প্রসারের সাথে সাথে রাজনৈতিক আলোড়ন এই কৃত্রিম পার্থক্যকে ক্রমেই সংকুচিত করে আনছিল। যেহেতু ঐতিহাসিকভাবে বিষয় মুখীনতা অনেকখানি মানুষের সামাজিক তৎপরতার সৃষ্টি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে আমাদের দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর অংশগ্রহণের ব্যাপকতা, আন্দোলনের গণভিত্তিক প্রসার আমাদের শিল্প সংস্কৃতিতেও স্বাক্ষর রেখেছে। দেশভাগের পর নতুন স্বাতন্ত্রবোধে উজ্জ্বল বাংলাদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণী নতুন করে তার ঐতিহ্যের সন্ধানে বেরিয়ে ব্যাপক অর্থে যে সাংস্কৃতিক যোগমৃত সম্পর্কে তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছে, তার পেছনে স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেয়ে নিজের স্বরূপ উপলব্ধির তাগিদটাই মুখ্য ছিল। প্রতিক্রিয়ার আঘাতের মুখে এদেশের উপন্যাস সাহিত্যের ফসল এখন সংকুচিত, সামাজিক বিরুদ্ধ পরিবেশে মানবিক মূল্যবোধ নিরূপনের ক্ষেত্রে কিছুটা দোদুল্যগ্রস্ত মনে হয়েছে শিল্পী সাহিত্যিককে তার পেছনে মধ্যবিত্তসুলভ অহমিকাকে কেউ কেউ অযথা বাড়িয়ে দেখাতে চেয়েছে এবং বাংলা সাহিত্যকে হিন্দুবাংলা সাহিত্য ও মুসলিমবাংলা সাহিত্যের কৃত্রিম বিভাগের বিভ্রান্তমূলক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু দেশ বিভাগোত্তরকালে সৃষ্ট সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সমস্যা কখনও প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি। দেশভাগের পর পূর্ববাংলায় লিখিত প্রথম উপন্যাস 'সূর্যদীঘল বাড়ী'কে (আবু ইসহাক লিখিত) হয়তো উপন্যাস অপেক্ষা উপন্যাসের একটা নক্সা বলা সমাচীন। তবুও এই

উপন্যাসটিতে যে সামাজিক সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে, তার নিরিখে নতুন মূল্যবোধ বিধৃত 'মুসলিম' চরিত্র চিত্রন নয় স্বাভাবিক ভাবেই সাহিত্যে সমাজের যেখানে একাংশ এতদিন অনালোকিত ছিল, সেই সীমাবদ্ধ গণ্ডী ধীরে ধীরে উত্তোলিত হতে থাকে। যদিও একাজ চলেছে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস শিল্পের প্রকাশের ধারায়, কিন্তু সেখানে তার প্রবেশ ঘটেছে সীমিত চত্বরে—সমগ্র সামাজিক পটভূমিতে কোন চরিত্রের সাক্ষাৎ যেখানে মেলে না, লেখকদের সামাজিক অবস্থার ও প্রভাব শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা কোথাও সচেতন ও অচেতনভাবে এজন্য দায়ী ছিল। কিন্তু কোনও সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন রাখা দীর্ঘদিন সম্ভব নয়। কারন মহাকাব্য যেখানে আশ্চর্য মানুষের সামাজিক জীবনের একটা সমগ্র জনগোষ্ঠীর দ্বারা রচিত জীবনের আলেখ্য, সেখানে কবি শুধুমাত্র ঘটনাবলীর মালাকার হিসাবে উঠে আসেন স্রষ্টা হিসাবে। অপরদিকে উপন্যাস একজন শিল্পীর রচিত একটা জনগোষ্ঠীর সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার আলেখ্য। জাতি সমগ্রভাবে এবং ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে এক দ্বান্দ্বিক ঐক্যের ধারায় উপন্যাসে ফুটে থাকে। শ্রেণীসত্তা ও সামাজিক কল্যাণ উপন্যাসের বৈশিষ্টকে তুলে ধরে।

সুতরাং দেখা গেল সামাজিকভাবে স্বতন্ত্র মূল্যবোধে দীপ্ত সামন্তবাদী জনধারনার বাইরে স্বাক্ষর রাখার প্রয়াস বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্য প্রথমাবধিই সমাজ অন্তর্গত অসঙ্গতির উপর জোর দিয়েছে, সৈয়দ ওয়ালিউল্লার 'লাল শালু'তে এদেশের মধ্যবিত্ত মানসের যে ধারাটিকে ক্ষণজীবি হলেও প্রানবন্ত করে তুলেছে, 'চাঁদের অমাবস্যায়' এক সামাজিক রাজনৈতিক ভাবে পিষ্ট মানুষের দীর্ঘ আত্মার ক্রন্দনকে ব্যক্ত করেছে, আমাদের মধ্যবিত্তসুলভ কাপুরুষতাকে কষাঘাত করেছে। পরবর্তী সময়ে এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের বেগবান ধারায় আমরা জহির রায়হানের "হাজার বছর ধরে" উপন্যাসটি পাই। মানবিক মূল্যবোধে দীপ্ত রূপটিকে তিনি এনেছেন নতুন ভাবে। রনেশ দাশ গুপ্তের ভাষায় 'জীবন থেকে তত্ত্বে উত্তরণের শিল্পরূপ সমৃদ্ধ এ উপন্যাস।' আলাউদ্দিন আল আজাদ 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাস ভেঙে-পড়া মধ্যবিত্ত ও সমাজ মানসিকতা ফুটাতে চেয়েছেন এবং মানব মুক্তির জন্য যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংঘাত এ দেশে প্রবল হয়ে উঠিছিল, তার সচেতনতায় চরিত্রগুলি আক্রান্ত।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে যারা এগিয়ে এসেছেন ছোটগল্পের অতৃপ্তির আয়োজনে তুষ্ট না থেকে, তাদের মধ্যে সরদার জয়েনউদ্দিন (অনেক সূর্যের আশা) শওকত ওসমান, রাজনৈতিক ভাবে সচেতন দৃষ্টিভঙ্গীই আরোপ করেছেন তাদের উপন্যাসে। পাকিস্তানী আমলে প্রতিনিয়ত এক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানবিক মূল্যবোধকে তীক্ষ্ণ ভাবে সামনে উপস্থাপনই ছিল এদের প্রতিবাদের ভাষা। এ দেশের সামাজিক জীবনে সারেং-এর জীবনযাত্রার ও মানসিকতার স্বরূপ দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন শহীদুল্লাহ কায়সার, একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে এবং এ দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মপ্রবাহের সাথে প্রচণ্ডভাবে জড়িত থেকে সামাজিক জীবনের নিগূঢ় রূপটিকে তিনি উপলব্ধি করেছেন অন্তরঙ্গ ভাবে। তার সেই উপলব্ধির সার্থক ফসল 'সংশপ্তক'। তিনটি যুগকে তিনি এই সুবৃহৎ উপন্যাসে লালন করেছে। যে বিষয়মুখীনতা মানুষের সামাজিক কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি তার—ব্যাপকতাকে তিনি নিপুনতার সাথে এ উপন্যাসে উপস্থিত করেছেন। সামন্তসমাজে প্রোথিত মানবিক মূল্যবোধের নিষ্পেষিত সভা, আর সংগ্রাম এ-উপন্যাসের উপজীব্য। সমাজের যে দিকটি ছিল চাঁদের অপর পিঠের মতো অন্ধকারে যা কখনও তার সমগ্র স্বরূপে আমাদের শিল্পের আলোকে দৃষ্ট হয় নি, তাকে তিনি তুলে ধরেছেন কিন্তু কোথাও তিনি এ ঘোষণা করেন নি। কারণ এধরনের স্থূলতা তার কাছে অকিঞ্চিৎকর মনে হয়েছে।

আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে অবশ্যই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও তার যন্ত্রনা, মনোবিকলন, আত্মরতির স্থানও রয়েছে। বেশ কিছু উপন্যাসিক মানবজীবনের এদিকটিকেও তুলে ধরেছেন। ব্যক্তিক দ্বন্দ্ব যন্ত্রনার প্রখরতায় সৈয়দ শামসুল হকের 'অনুপম দিন' এর পাশাপাশি আহমদ ছফার যুগজিজ্ঞাসায় যন্ত্রনাদীর্ণ উপন্যাস 'নিশীথ কাহিনী' যেমন রয়েছে, তেমনি মুক্তিযুদ্ধের সময় লেখা শওকত ওসমানের 'জাহান্নাম থেকে বিদায়' শেষ উপন্যাসটিতে ক্রোধের সাথে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে উপযোগিতাবাদী মনোভাব শিল্পরূপকে কিছুটা খর্ব করেছে।

বাংলাদেশে উপন্যাসের নায়ক নায়িকার নানা শ্রেণী ও নানা স্তরের অথচ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চরিত্রগুলো প্রতিনিধি স্থানীয় হয়ে উঠেছে একথা বলা চলে না। এছাড়া আমাদের দেশে প্রকাশিত বেশ কিছু

উপন্যাস মামুলী উপাখ্যান নিয়ে রচিত। শুধু ছাপ পড়েছে যুগের মানসিকতার এবং ভাষারীতির নৈপুন্য যতটা চমক সৃষ্টি করে তার বক্তব্য কখনও তেমন গভীরে পৌঁছায়নি। পাকিস্তান আমলে যে সমস্যাটা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল অনেক ক্ষেত্রে লেখকদের নীরব প্রতিবাদ উপন্যাসের শরীরে প্রচছন্ন রয়েছে। এই প্রচছন্নতার জন্যই চরিত্রগুলো প্রতিনিধি স্থানীয় হয় নি। সমাজদেহের রোগ নয় উপসর্গ বর্ণনার ক্ষেত্র মধ্যবিত্ত চরিত্র বিন্যাসের নিরাপদ দূরত্বে স্থান করে নিয়েছে।

সাহিত্যের বাস্তবতার সমস্যা নিয়ে আধুনিক লেখকদের অর্থাৎ রাজনৈতিক সচেতন লেখকদের মানসযাত্রা তা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সৃজনশীল ধারাকে আশানুরূপ সমৃদ্ধি দেয় নি। কারণ অতীতে যতটা শ্বাসরোধীয় অবস্থায় সামাজিক লক্ষণগুলোর মূল অন্বেষন ও বিশ্লেষন সর্বদা নিরাপদ ছিল না। জনগণের সামাজিক জীবনযাত্রা ব্যক্তিক জীবনের অন্বেষন ও যন্ত্রনা আর এসব সামাজিক লক্ষনের গতি প্রকৃতি কোন দিকে ধাবিত তা অনেক ক্ষেত্রেই অনুচচারিত।

—সন্তোষ গুপ্ত

ভাষা ও সংস্কৃতির বাহন বাংলাদেশের সংবাদপত্র

সংবাদ পত্র লোক সংযোগের মাধ্যম, বার্তা ও অভিমত প্রচারই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে সংবাদপত্রগুলো শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটায়, ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। পৃথিবীর কোন সংবাদপত্রই এখন আর নিছক খবর বা অভিমতের বাহন নয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতিকমূলক নিবন্ধ, সমাজ ও মানুষ সম্পর্কিত রচনা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে নিয়েছে, পাঠকের মন শুধু খবর পড়ে তৃপ্ত নয়। তাঁরা চান গভীরতর বিশ্লেষণ, সংবাদের পটভূমি, মানুষকে হাসি-কান্নায় আন্দোলিত করে এমন সব কিছু ঘটনার বর্ণনা। এই বর্ণনার বাহন আবার ভাষা এবং ভাষার তেমন রূপ যা সকল স্তরের মানুষের কাছে বোধগম্য, গ্রহণযোগ্য। এই সব কারণে সংবাদপত্রগুলি সংস্কৃতি বিস্তার ও ভাষা প্রচলনের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখতে সমর্থ হচ্ছে। বিতর্কের আশঙ্কা না রেখেই সম্ভবতঃ একথা বলা যায় যে বিভিন্ন ভাষা উন্নয়ন ও ভাষার গতিশীলতা বজায় রাখার ব্যাপারে সংবাদপত্রগুলোই এখন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সংবাদপত্রের প্রয়োজনে নিত্যনতুন শব্দ সংযোজিত হচ্ছে প্রতিটি সজীব ভাষার অভিধানে, ভাব বিকাশের ভঙ্গী ও পদ্ধতি হয়ে উঠছে প্রাঞ্জল, হৃদয়গ্রাহী।

বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোর জন্যে এর চাইতে বৃহত্তর ভূমিকা নির্ধারিত। এখানে আমি অবশ্যই বাংলা সংবাদপত্রের কথা বলছি। সংবাদ প্রচার, সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর বিবরণ বহন, জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে সহায়তা দান ইত্যাদি প্রত্যাশিক ভূমিকা পালন করা ছাড়াও বাংলা

খবরের কাগজগুলো ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষার প্রচলন ঘটাচ্ছে, বাঙ্গালী সংস্কৃতির দর্পন হিসেবে কাজ করছে। এই দাবী উত্থাপন করার পেছনে যথেষ্ট যুক্তির সমর্থন বিদ্যমান। আমাদের দেশের বিশেষ সামাজিক ও সংস্কৃতির পরিস্থিতির দরুণই সংবাদপত্রের উপর এই গুরু দায়িত্ব বর্তেছে বলে আমি মনে করি।

পাকিস্তান আমলে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর অসংখ্য বিধিনিষেধের দরুণ বাংলা ভাষার বিকাশের পথ একদিকে যেমন রুদ্ধ হয়ে রয়েছে অন্যদিকে তেমনি আমাদের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি খুঁজে পায়নি আত্মপ্রকাশের পথ। পাকিস্তানী শাসনের চব্বিশ বছরে আমাদের দেশে একটি সাহিত্য সাময়িকীও দীর্ঘায়ু পায়নি, সরকারী আওতার বাইরে মাথা তুলতে পারেনি একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা ক্ষেত্রে ইংরেজীর প্রাধান্য বজায় থেকে বরাবর, আরবী, উর্দুর হামলায় ব্যতিব্যস্ত হতে হয়েছে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সমাজকে এই শূন্যতার মধ্যে বাংলা সংবাদপত্রগুলো কমবেশী বাংলা ভাষার প্রচলন ঘটিয়েছে, কাজ করেছে সংস্কৃতির বাহন হিসেবে। অবশ্য প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রগুলো ভাষার বিকৃতি ঘটিয়ে, সংস্কৃতির অপব্যাখ্যা দিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টাও কম করেনি।

এখন স্বাধীন বাংলাদেশে সংবাদপত্রের পথ থেকে সেই সব বাধা অপসারিত। এবং যতদিন অন্যান্য লোক-সংযোগ মাধ্যমগুলো তাদের ভূমিকা গুছিয়ে নিতে সক্ষম না হচ্ছে ততদিন সংবাদপত্রগুলো ভাষার প্রচলন ও সংস্কৃতি বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকবে। তার কারণ, প্রথমতর, বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেই বাংলাভাষা পুরোপুরি ব্যবহৃত হচ্ছে। কথাটা হয়ত একটু উদ্ভট শোনাবে কিন্তু যদি একথা আমরা মনে করি যে টেলিগ্রাম-টেলিপ্রিন্টারে ইংরেজী ভাষায় খবরের কাগজ প্রকাশনার পথে পরিভাষা, শব্দার্থ বা প্রকাশ ভঙ্গী কোন বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না তাহলেই বাংলা প্রচলনে সংবাদপত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে। এই পত্রিকায় যে সব নতুন শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে, প্রকাশ ভঙ্গিতে যে সব পরিবর্তন আসছে বাংলাভাষার উন্নয়নে সে সবের ভূমিকাও কম নয়। দ্বিতীয়তঃ, সাহিত্য সাময়িকীর অনুপস্থিতিতে দৈনিক সংবাদপত্রগুলোই গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ এমন কি উপন্যাস প্রকাশের দায়িত্ব বহন করছে। দৈনিক পত্রিকায় কবিতার আধিক্য অনেকের কাছেই বিস্ময়ের ব্যাপার কিন্তু আমাদের

দেশের সংবাদপত্রকে সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রচারের মাধ্যম হিসেবেও কাজ করতে হচ্ছে স্বীকার করতে হবে, বাংলা সংবাদপত্রগুলি এই গুরুদায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গেই বহণ করে চলছে। তৃতীয়তঃ, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ শিক্ষা বঞ্চিত এবং সংবাদপত্রের পাঠক সমাজ শিক্ষাগত উৎকর্ষের এক সমতলে অবস্থান করেন না বলে সংবাদপত্রের ভাষা বাধ্যতামূলক ভাবেই হয়ে উঠছে সহজ, সরল, সর্বজনগ্রাহ্য। ভাষার এই অভিব্যক্তিই একান্তভাবে কাম্য।

কিন্তু তাই বলে ভাষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের মাধ্যম রূপে সংবাদপত্রের সামনে কোন বাধা বা সমস্যা নেই একথা মনে করা ভুল। সর্তক ও সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলে বাংলা সংবাদপত্রগুলি মাতৃভাষার উৎকর্ষ এবং সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। প্রথমে ভাষাগত সমস্যাগুলি বিবেচনা করে দেখা যাক। সংবাদপত্রে বাংলাভাষার পুরোপুরি ব্যবহার ঘটছে, ভাষান্তরনের অসুবিধাগুলো কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে না একথা ঠিকই কিন্তু সংবাদপত্রের ভাষা আজ পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড রূপ গ্রহণ করেনি। আমি অবশ্যই একথা বলছিনা যে সব সংবাদপত্রে ভাষার রূপ হুবহু এক হতে হবে ইংরেজীর প্রতিশব্দ, ক্রিয়াপদ, বিশেষণ, বাক্য বিন্যাস পদ্ধতি ইত্যাদি ব্যাপারে নিশ্চয়ই একটা সুনির্দিষ্ট ছাঁচ গড়ে তোলা সম্ভব। ঢাকা থেকে প্রকাশিত অধিকাংশে বাংলা সংবাদপত্র চলতি বা কথ্য ভাষা ব্যবহৃত হয় কিন্তু সাধু রূপের ব্যবহারও যথেষ্ট চোখে পড়ে। ফলে পাঠকদের মনে ভাষার রূপ সম্পর্কে সংশয় স্থায়ী হয়ে থাকছে। চলতি ভাষার ব্যবহারও আবার বিচ্যুতি মুক্ত নয়। শুধু ক্রিয়াপদের সংস্কার সাধন করেই ভাষাকে চলতি রূপ দেখা হচ্ছে ; শব্দ ব্যবহারের বেলায় সাধু রূপের দিকেই ঝোক দেখা যাচ্ছে বেশী। অন্যদিকে বানান পদ্ধতি সম্পর্কে কোন অভিন্ন নীতি অনুসরন করা হচ্ছে না—এমন কি একই সংবাদপত্রে একই বানানের দু'টি রূপ দেখা যাচ্ছে পাশাপাশি। এরপর আছে, ব্যাকরণ গত ত্রুটি, প্রকাশ গত বিচ্যুতিও অনুবাদগত ব্যাকরণের প্রতি অবজ্ঞা বা ব্যাকরণের নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞতা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ভাষাগত নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে বললেও সম্ভবতঃ অত্যুক্তি হবে না। শব্দ ব্যবহার এবং বাক্য বিন্যাসের বেলায়ও অসতর্কতার নিদর্শন চোখে পড়ে অসংখ্য। অভিধানের ব্যবহার আজকাল

উঠে গেছে বললেই হয়। ইংরেজী থেকে তরজমার সময় এক এক সংবাদপত্র এক এক ধরনের শব্দ ব্যবহার করে, তাদের মধ্যে ভাষাগত কোন 'ইউনিফরমিটি' থাকে না।

বাংলাভাষার এখানে কোন সুনির্দিষ্ট লেখ্যরূপ পায়নি বলেই এত সংশয়। যতদিন যাচ্ছে এই সংশয় বাড়ছে; স্তুপীকৃত হচ্ছে ভাষাগত ভুলের নিদর্শন। আমরা যদি বাংলাভাষার কল্যাণ চাই তাহলে ভাষার ব্যবহারে যেমন সতর্ক, নিয়মনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধাশীল হতে হবে তেমনি সংবাদ পত্রের জন্যে গড়ে তুলতে হবে ভাষার একটি নির্ভুল, স্বচ্ছ সুন্দর রূপ।

এই কারণে আমি মনে করি, বাংলা ভাষার বিশেষজ্ঞ এবং সাংবাদিকদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে তাঁদের উপর বানান পদ্ধতি ও ভাষার মোটামুটি রূপ বেঁধে দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত। তাহলে বাংলা ভাষার লেখ্যরূপ সুনির্দিষ্ট হয়ে উঠবে। সংবাদপত্রের নিজস্ব উদ্যোগে, অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের সহায়তায় অনুবাদ ব্যবহারিক ত্রুটি বিচ্যুতি পরিহারেরের উদ্যোগে নেয়া দরকার। আমার ধারণা, কম সংবাদপত্রেই ব্যাকরণগত শুদ্ধতা এবং ভাষাগত সেষ্ঠীব পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থা আছে। ভাষা সংশোধন ও প্রকাশভঙ্গী সম্পাদনার উদ্যোগে নেয়া হলে বাংলা ভাষার বিশেষ উপকার সাধিত হবে।

সাংস্কৃতিক বাহনরূপে সংবাদপত্রের ভূমিকা যাতে আরও ব্যাপক আরও কার্যকর হয় সেজন্যে বিশেষ যত্নবান হতে হবে সাংবাদিকদের। সাময়িকীর অভাব যতদিন দূর না হচ্ছে ততদিন গল্প, কবিতা, এবং সাহিত্য, সংগীত ও শিল্প বিষয়ক নিবন্ধ ছাপার দায়িত্ব যেমন সংবাদপত্রকে পালন করতে হবে তেমনি মানুষের সামনে খুলে ধরতে হবে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্যের পরিচয়। খবর ও অভিমত প্রচার ছাড়াও বাংলাদেশের সংবাদপত্র যাতে এই বৃহত্তর দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে সক্ষম হয় সে জন্যে সাংবাদিকদের বিশেষভাবে উদ্যোগী হতে হবে।

—আহমেদ হুমায়ূন

বাংলাদেশের শিশু সাহিত্য

সুবাতাস বইতে শুরু করেছে ষাট দশকের পর থেকে। বাংলাদেশের শিশু সাহিত্যের অবয়বে তখন সুস্থ রক্ত। দীপ্তি ভর করছে ভাষার গাথুঁনীতে এবং জ্বলজ্বলে হচ্ছে, যেন নতুন বাঁক নিল নদী। উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ফসলের প্রান্তর। ফসলের তরতাজা গন্ধ এসে লাগলো শিশু সাহিত্যের অঙগনটতে। সারি সারি সততার পিদুম জ্বলে উঠলো। আমরা যারা অভিভূত চাষা তারা দেখলাম ফসলের গুচ্ছে নিবেদিত, পরিশ্রমী হাত।

এর আগের অবস্থাটা কি ছিল ? কেন নীরক্ত আর পাংশু ছিল শিশু সাহিত্য ? আসলে তখন জোর করে ঐতিহ্য নির্ভর করার চেষ্টা হচ্ছিল শিশুতোষ রচনাবলীকে। ধর্মীয় গোড়াঁমী ছিল। সংকীর্নতার অসুস্থ উল্লাস ছিল। আর তাই পলিমাটি সিক্ত, ভেজা, ছলোছলো মাটিতে মরুভুমি সংস্থাপিত করা হচ্ছিল। জাম বট, জারুলের সীমানা ছাড়িয়ে প্রকট হচ্ছিল খর্জুর বৃক্ষ। ফিঙে, কোয়েলের চাইতেও প্রাধান্য ছিল উটের। ‘‘কাজীর বিচার’’ জাতীয় গল্প, বাগদাদের গলিপথ, ইত্যকার রচনাবলী অবিরল প্রজননে ক্লান্ত. করুণ এবং বিমর্ষ করে তুলছিল আমাদের শিশু সাহিত্যের শাখাটিকে। যে দুঃসাহসিকতা শিশু মনকে সমুদ্রমুখী করে, প্রবাল দ্বীপের ঝোড়ো বাতাসে নিয়ে উদ্বেলিত করে, বিশাল তৃনপ্রান্তরে বুনোঘোড়ার পিঠে চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়, তা ছিল না। ছিল না নদীর প্রচণ্ড তরঙ্গ কিংবা অরণ্যের বিস্তার। শিল্পিত বিন্যাস ছিল না। আধুনিকতা ছিল না। সবুজ শৈশব কোথায় এসে জলজ্বলে কৈশোরে পেঁাছায় তার কোন সুস্পষ্ট স্বাক্ষর ছিল না। ঘুমন্ত মসৃন শৈশবে সমস্ত সমস্যার সমাধা। এমন কি সেখানে সমস্যাও কখনো কখনো সমাধানেরই প্রতিশব্দ। অতঃপর

কৈশোর জাগরনের উন্মেষ। এই জাগরনকে নন্দিত করার কোন লক্ষ্যনই ছিল না ষাট পূর্ববর্তী বাংলাদেশের শিশু সাহিত্যে।

আসলে আলোর ফুলকি ছিল না তখন। কোন আলোর ফুলকি! অবন ঠাকুরের ভাষায় "এই জগৎসুদ্ধ সবার কান্না আলোর প্রার্থনা এক হয়ে যখন আমার কাছে আসে তখন আমি আর ছোটো পাখিটি থাকিনে বুক আমার বেড়ে যায়। সেখানে প্রকাণ্ড আলোর বাজনা বাজছে শুনি, আমার দুই পাঁজর কাঁপিয়ে তারপর আমার গান ফোটে 'আ-লো-র ফুল।' আর তাই শুনে পুবের আকাশ গোলাপী কুঁড়িতে ভরে উঠতে থাকে কাক সন্ধ্যার কা কা শব্দ দিয়ে রাত্রি আমার গানের সুর চেপে দিতে চায় কিন্তু আমি গেয়ে চলি। আকাশে কাগডিমে রং লাগে তবু আমি গেয়ে চলি আলোর ফুল। তারপর হঠাৎ চমকে দেখি আমার বুক সুরের রঙে রাঙা হয়ে গেছে আর আকাশে আলোর জবা ফুলটি ফুটিয়ে তুলেছি আমি।"

যেন এই আলোর ফুলেরই ভীষন অভাব ছিল সেই সময়কার ধূসর দিন গুলোতে। আমাদের শিশুরা উল্লসিত হয়ে উঠতে পারে স্বদেশের মাটির দিকে প্রোথিত করতে পারে তাদের জীবন মূলকে এমন সাহিত্য গুন সম্বলিত রচনাবলী ছিলনা। এমন কি বাংলাদেশের নিসর্গের বিশ্বস্ত রূপায়নও ছিল না।

পরিবর্তনের ধাক্কা এসে লাগলো ষাটের দশকে। সামাজিক বিন্যাসের ক্ষেত্রেও তখন পরিবর্তন প্রকট হয়ে উঠছে। দেশে ভারী শিল্পের প্রসার ঘটছে। নগরায়ন বিস্তৃত হচ্ছে। সেই সময় শিশু সাহিত্যের জন্য নিষ্ঠাবান হৃদয় সমর্পিত হলো। তারা স্বদেশের সত্যিকারের ঐতিহ্যের সংগে তার মাটির সোদাঁ গন্ধের সাথে লতাগুল্ম পত্র পুষ্পের সাথে ছোটদের নিবিড় ভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইলেন। নিসর্গ প্রীতি বিস্তৃত হলো। বাংলাদেশের শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন স্বাদ, আমেজ এলো। অজস্র পাখির নাম, গাছের নাম, নদীর নাম ব্যবহৃত হয়ে এদেশের শিশুসাহিত্যকে এক পবিত্র এবং সৎ অবয়ব দেয়া হলো।

সবচাইতে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠলো ছড়ার অঙ্গনটি। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা শ্রেনী বৈষম্য, এ সব কিছুই টুকরো টুকরো ভাবে এসে প্রবল অভিঘাতে স্পন্দন তুললো। উনসত্তুরের উত্তাল দিনগুলোর অগ্নিগর্ভ ছড়া আলোড়িত করেনি

এমন সচেতন বঙ্গবাসী খুব কমই আছেন। আসলে সুস্পষ্ট প্রত্যয় ছিল তৎকালীন লেখকদের নিত্য জাগরনে। ঋজু বক্তব্য, তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতনতা, সত্যের প্রতি প্রবল আস্থা তুমুল গাঢ় সমাচারের মতো তখন হয়ে উঠছিল।

বাঁক নিচ্ছিল আরেকটি দিকে। ফ্যাণ্টাসী নির্ভর বিশ্বস্ত রহস্যময় পরিবেশ, অলৈকিক গল্প ভূতের গল্প দারুন দক্ষতায় লিখিত হচ্ছিল মুষ্টিমেয় লেখকের মানসিক স্বেদের মাঝ দিয়ে। একজন সম্পূর্ন নতুন ধরনের সামুদ্রিক ভিজে বাতাস প্রবাহিত করে দিলেন। তিনি লিখলেন সমুদ্র নিয়ে, নিঃসঙ্গ নাবিক নিয়ে, বন্দর নিয়ে আর মধ্যপ্রাচ্যের জলপাই বন এবং স্পেনের উজ্জ্বল রোদ তাকে আকৃষ্ট করলো। চমৎকার চিত্রকল্পে তিনি শিশু সাহিত্যে এগুলো আনয়ন করলেন।

এটা ঠিক যে আমাদের শিশু সাহিত্য সবসময় ডন কুইকসোটের মতো হয়েছে কিন্তু ইউলিসিসের মতো দুঃসাহসী হতে পারেনি। নিঃসন্দেহে অভিযোগ তোলা যায় লেখকদের বিরুদ্ধে। তারা কখনো সততার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করেননি। শিশু সাহিত্যের সীমানা এবং পরিসরকে বিস্তৃত এবং আধুনিকতর করার আন্তরিক প্রয়াস খুব কমই পরিলক্ষিত হয়েছে। যে প্রবল রক্তাক্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের এখানে হয়ে গেল সেটাও আমাদের শিশু সাহিত্যের প্রবল অভিঘাতে আসেনি। কোথায় সেই উজ্জ্বল বিদ্রোহ এবং রক্তাক্ত আলোড়ন। কোথায় নিসর্গের ফাঁকে ফাঁকে অস্ত্র তুলে ধরা মুক্তিযোদ্ধাদের চেহারা? কোথায় সেই রক্তের দাগ যা কিনা কলাপাতা বাঁশঝাড় এবং ঘাসফুলকে রাঙা করেছে?

বিষয় বস্তু কতো বৈচিত্র্যে প্রচণ্ড গতিতে সম্প্রসারিত হয়ে গেছে সেই অস্থিরতাময় দিনগুলোর মাঝ দিয়ে। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মাঝে যে কিশোর ষ্টেনহাতে মেঘনা পাড়ি দিয়েছে, সিলেটের আনারস ঝোপের মাঝে তীক্ষ্ণ হয়েছে যাদের চোখ জলপাই রঙ জীপের শব্দ শোনার জন্যে সেইসব উৎকণ্ঠিত মুহূর্ত্তের স্পন্দনতো আমাদের শিশু সাহিত্যে এলোনা। জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং তার রক্তিম বোধ থেকে সরে গিয়ে কোনদিন সৎ সাহিত্য রচিত হতে পারে না।

আমরা আশাবাদী। বাংলাদেশের শিশু সাহিত্যে সেই উজ্জ্বল কান্তিময় জীবন আসবে। শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত হবে রক্ত; সুস্থ, সরল, সৎ।

—আলী ইমাম

বাংলাদেশে বিজ্ঞান চর্চা

মানব সভ্যতার ইতিহাস মূলতঃ বিজ্ঞানের ক্রমাগ্রগতির ইতিহাস। মহান কার্ল মার্কস মানব সমাজের ইতিহাসকে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস হিসেবে বর্ণনা করে সর্বপ্রথম মানব জাতির অগ্রগতির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে বস্তুভিত্তিক উপাদানকে স্বীকৃত করেছেন। বিভিন্ন যুগে শ্রেণীগুলি আসলে সমাজ বিকাশের অবিশ্রান্ত ধারার পরস্পর বিরোধী উপাদান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে উৎপাদনের সাথে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের লোকদের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে। আর এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে উৎপাদনের হাতিয়ার, বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করছে। বিজ্ঞান মানব সভ্যতার অগ্রগতির বিশৃস্থ শক্তি। আধুনিক বিজ্ঞানের মূল কতগুলি আবিষ্কারই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বিকাশের প্রাথমিক শর্তাবলী সৃষ্টি করেছে। আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানই পৃথিবীকে তার নূতন চালক প্রসেতারিয়েত তবে উপহার দিয়েছে। বিজ্ঞান শুধুমাত্র বস্তুর দৈহিক রূপের পরিবর্তন ঘটিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। সাথে সাথে তাত্ত্বিক বিজ্ঞান আক্রমন করছে সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান ধারনার ভিত্তি মূলে। সামন্তবাদ উচ্ছেদে ফরাসী বিপ্লবীদের চেয়ে গ্যালিলিও-কোপারনিকাশের গ্রহ-গতি সম্পর্কীয় ও ডারউইনের প্রকৃতি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কম অবদান রাখে নি। তাই কোন দেশে বিজ্ঞান চর্চা সেই দেশের সমাজ ও অর্থনীতি থেকে কোনভাবেই পৃথক থাকতে পারে না।

বাঙলাদেশে বিজ্ঞান চর্চার কথা আলোচনা করতে হলে আমাদের সর্বপ্রথম বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা

করতে হবে। সাড়ে সাত কোটি নিরক্ষর অনাহার ক্লিষ্ট মানবগোষ্ঠী নিয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এই দেশ শত শত বর্ষ ব্যাপী পরাধীনতার গ্লানি বহন করে চলেছে। পৃথিবীর একটি উন্নত জাতি দ্বারা লুণ্ঠিত হবার কারণেই এই দেশে কোন বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বৃটিশ জাতির বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এতই বিশাল ছিল যে নিজেদের প্রয়োজনেও তারা এদেশের সম্পদকে বৈজ্ঞানিক কাজে ব্যবহার করার কথা চিন্তাও করেনি। তাই আজ অবধি বাঙলাদেশে বিজ্ঞান চর্চার কোন সুসংহত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

সমাজে উদ্বৃত্ত সম্পদের সৃষ্টি হলেই শিল্প সাধনা সম্ভব। যখন সমাজ সম্পদের প্রাচুর্য্য ছিল তখন বাঙলা দেশে হাজার হাজার বৈরাগী, বাউল ও জন্ম হলেও কোন বৈজ্ঞানিকের জন্ম হয় নি। বৈজ্ঞানিক প্রগতি ঘটে সমাজ বিপ্লবের সময় সমাজের ক্রান্তি লগ্নে। ইংল্যাণ্ড এর বস্ত্র শিল্পের মন্থর গতি ও সংকটই আর্করাইটকে এবং খনির কয়লা তোলার বিরক্তিকর পরিবহণ ব্যবস্থাই ওয়াটকে ধাবিত করেছিল গবেষনার দিকে। কোন সামাজিক আকাঙখা ছাড়াই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বৃদ্ধিলাভ করে। বাঙলাদেশে বর্তমানে চলছে একটি বিরাট সামাজিক ভাঙ্গা গড়া। গতিজ্ঞানের নিউটনীয় সূত্র অনুযায়ী যেমন বস্তুর স্থিতি জড়তা আছে, তেমনি সমাজেরও একটা স্থিতি জড়তা আছে। তাই দেখা যায় সমাজ পরিবর্তিত হওয়ার পরও সে পিছুটান দিতে চায়। পুঁজিবাদ থেকে ফিরে যেতে চায় সামন্ত বাদে। সমাজতন্ত্র থেকে সংশোধনবাদের চোরাগলি দিয়ে ফিরে যেতে চায় পুঁজিবাদে। তাই সমাজ পরিবর্তনের জন্য ও উন্মেষলগ্নে একটি প্রয়োজনীয় কাজ হলো বল প্রয়োগ। বল প্রয়োগ, একটি বিপ্লবী শ্রেণীর বল প্রয়োগ ব্যাতীত বাঙলাদেশের সমাজের এই পিছুটানকে রোধকরা সম্ভব নয়। আর এই পিছুটান রুখতে না পারলে বাঙলাদেশে বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব নয়। কারণ বিজ্ঞান চর্চা আর কাব্য চর্চা একজিনিষ নয়। কবিতা জীবন উপলব্ধির প্রকাশ, বিজ্ঞানের কাজ সেই জীবনকে বদলে দেয়া। বিজ্ঞান চর্চার জন্য চাই উপযুক্ত ক্ষেত্র। টেবিলে বীজ রেখে দিলে গাছ হয় না। আর শুধু মাত্র বিজ্ঞানের প্রান হলো প্রয়োগ। আর প্রয়োগের জন্য চাই উপযুক্ত সামাজিক ক্ষেত্র এবং সমাজের প্রযুক্তিবিদ্যা গ্রহণ করার মানসিকতার। মানসিকতা আসবে সমাজের পরিবর্তন থেকে। সামন্ততান্ত্রিক দর্শনে আবদ্ধ আমাদের বিজ্ঞান সেবীরা নিজেরাই বিজ্ঞানকে স্বীয় জীবনে

গ্রহনে করেননি। এর প্রমান পাওয়া গেছে গত দশকে বহুবিজ্ঞান সেবী কতৃর্ক ভাববাদী রাজনৈতিক দর্শন সমর্থন। বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রধান লক্ষন হল এর ক্রমানুয় প্রয়োগ। প্রয়োগ করতে গিয়ে যে বাধা আসবে তা অতিক্রম করতে গিয়ে জন্ম হবে নূতন বিজ্ঞানের। ক্লাসিকাল মেকানিক্সের পরমানু বিজ্ঞানে প্রয়োগ থেকেই জন্ম হয়েছে নূতন বিজ্ঞানের কোয়ান্টাম মেকানিক্সের। কিন্তু বাঙলাদেশে বিজ্ঞান সেবীদের সেই সুযোগ নাই। আমরা কেবল ধর্মপুস্তকের মত বিজ্ঞানের শ্লোক মুখস্থ করি। ভবিষ্যৎ বংশধররা যাতে তা ভুলে না যায় আমাদের প্রয়োজন সমাজে ফুরিয়ে না যায়, তাই তা অন্যদের মুখস্থ করাই। বাঙলাদেশে তাই এটমিক ফিজিক্সের ছাত্র ব্যাঙ্কে চাকুরী নেয়। রসায়নে "কেমিক্যাল বণ্ডিং" এর ওপরে থিসিস পেশকারী কিছুদিন পর কাসটম অফিসার হয়। বাংলাদেশে আজকাল যা হচ্ছে তা হল বিজ্ঞানের অপচর্চা।

বাঙলাদেশে প্রকৃত বিজ্ঞান চর্চা শুধু মানসিকতার পরিবর্তন করে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সমাজের প্রয়োজন থেকে উদ্ভুত চাপ এবং চাহিদা। আর সমাজের এই পরিবর্তন হতে হবে একটি এগিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির নয়াউপনিবেশিক এই দেশের জন্য গনতান্ত্রিক বিপ্লব ও স্বাধীন অর্থনীতির প্রতিষ্ঠার সামগ্রিক সাফল্যই বাঙলাদেশে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় বহিস্থ বল—'দি ফার্ষ্ট ইমপালস্'।

—মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশঃ ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক সম্পদ

একটি জাতির সৃষ্টিতে যেমন যুগ যুগ আর বহু শতাব্দীর অবদান অনস্বীকার্য, ধীরে ধীরে প্রতিটি জাতি যেমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে মহামানবের সংসারে তার ঠাঁই করে নেয়, ঠিক তেমনি মহাকালের আবর্তনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল তার আপন সত্ত্বায় গড়ে ওঠে তারপর রূপ বদলায়। এই গড়ে ওঠার প্রাকৃতিক ইতিহাস চলমান। অতীতে সুবিশাল পাহাড় ক্রমে রূপ বদলিয়ে সমতল ভূমিতে পরিনত হয়েছে। কোথাও সাগর দূর দূরান্তে সরে চলে গেছে আর তার ফেলে যাওয়া পথে গড়ে উঠেছে পর্বতমালা। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি বছর ধরে প্রকৃতি নব নব রূপ দিয়েছে দিকে দিকে। বাংলার মাটিও নব নব রূপ ধারণ করেছে অতীতে। আজও করছে। সমস্ত পৃথিবীর প্রকৃতিতে ভাঙা গড়া চলছে। কিন্তু ধীরে ধীরে। আমাদের ব্যক্তি বিশেষের স্বল্প জীবন কাল সেই কোটি কোটি বছরের সামনে একটি মুহূর্ত মাত্র। প্রকৃতির এই ভাঙা আর গড়ার বিরামহীন চলমান প্রক্রিয়ার স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে বিশ্ববিশ্রুত ভূ-বিদ জেমস হাটন ১৭৮৫ সালে বলেছিলেন : "We find no trace of a beginning,—no prospect to an end."

এই ভাঙা গড়ার প্রাকৃতিক আবর্তনের মধ্যে দিয়েই আজকের বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চল গড়ে উঠেছে। সদ্য রক্তস্নাত বাংলাদেশ জগত সভায় যেমন আজ তার আসন করে নিয়েছে, ঠিক তেমনি এই দেশ মহা অতীতেও যুগের পর যুগ ধরে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী হয়েছে। যে সম্পদভার নিয়ে বাংলাদেশ এতদিন ঘুমিয়ে ছিল আজ

তার বিলিয়ে দেবার সময় এসেছে। বাংলা-মাটির হাতছানিতে সাড়া দিয়েছে আজ বাংলার ভূ-বিদগণ। তাঁরা এর মাটির নীচে খুঁজে পেয়েছেন কয়লা, পিট, গ্যাস, চুনাপাথর, শ্বেতকাদা, কাঁচবালি, ভারীবালি আর শক্তপাথর। কাদামাটির দেশের কাদাও তাঁদের কাছে নতুন রূপে ধরা দিয়েছে।

কয়লা ।।

আজ থেকে প্রায় চব্বিশ/পঁচিশ কোটি বছর আগে, গণ্ডোয়ানা যুগে, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ঘন অরণ্যে ঢাকা ছিল উত্তর বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সেদিন এ অঞ্চল ছিল জলাভূমির রাজ্য—স্যাঁতসেঁতে এক দেশ। ছোট বড় গাছে ভরা এক অরণ্য। তারপর গত হল আরো লক্ষ লক্ষ বছর। সেই সব অরণ্যের গাছপালা থেকে পরে কয়লার উৎপত্তি হয়েছে ধীরে ধীরে। কালের গতিতে সেই ঘন অরণ্য-এলাকার সমাপ্তি ঘটে, তার উপর শিলা জমে। তারপর এক সময়, এখন থেকে প্রায় পাঁচ কোটি বছর আগে, এই এলাকা সাগর জলে তলিয়ে যায়।

১৯৫৯ সালে স্ট্যানডার্ড ভ্যাকুয়াম তেল কোম্পানী বগুড়ার কাছে ভূত্বকের ৭৮১১ ফিট থেকে নিয়ে ৯৪৩৩ ফিটের মধ্যে এই কয়লার সন্ধান পায়। পরে দেশের ভূতাত্ত্বিক জরীপ বিভাগ জাতিসঙ্ঘের সহায়তায় কয়লা কি পরিমাণ আছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালায় এবং কোথায় খনি করা যেতে পারে তা ঠিক করে। ১৯৬২ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বগুড়া-রাজশাহী এলাকায় ড্রিলিং চালানো হয়। এখানে প্রায় তিন হাজার ফিট নীচে উন্নত মানের বিটুমিনাস কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই কয়লার প্রমানিত পরিমাণ এক "বিলিয়ন" টন বা একশ' কোটি টন। একদিন এই এলাকার জামালগঞ্জে কয়লা খনি অঞ্চল গড়ে উঠবে।

বাংলাদেশের মাটিতে কয়লার খনি স্থাপিত হলে আমাদের অর্থনৈতিক জীবন সুন্দরতর হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধুমাত্র জামালগঞ্জের কয়লা বাংলাদেশের চাহিদা আগামী অন্তত দুশো বছর ধরে মেটাতে পারে। আশা করা যায় জামালগঞ্জের উত্তর-পূর্ব দিকে আরও কয়লা পাওয়া যাবে।

পিট ।।

ফরিদপুরের বাঘিয়া এবং চান্দা বিলে আনুমানিক একশো কোটি

টন পিট কয়লা আছে। ফরিদপুরের পিট কয়লা খুব নিম্নমানের হলেও ভবিষ্যতে এই পিট দেশের কাজে আসবে বলে মনে হয়।

চুনাপাথর ।।

উত্তর বাংলায় কয়লা স্তরের উপরে পাললিক শিলাস্তর জমা লাগে। পরে এই সব এলাকা উষ্ণসাগরের পানিতে ডুবে যায়। এই উষ্ণসাগরের জলে খেলা করতো, সাঁতরাতো একরকমের এক কোষ বিশিষ্ট জীব। তাদের নাম ফোরামিনিফেরা (Foraminifera)। ওদের জীবন সাঙ্গ হয়ে গেলে ওদের দেহের খোলসটা তলিয়ে যেত সাগরের তলদেশে। সেই ইওসিন (Eocene) যুগে প্রায় পাঁচ কোটি বছর আগে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটে গঠিত তাদের সেই দেহাবশেষ সাগরের তলদেশে জমে জমে এক সময় আজকের উত্তর বাংলার চুনাপাথরের উৎপত্তি ঘটায়।

জয়পুরহাট—জামালগঞ্জ এলাকায় প্রায় দেড় হাজার ফিট নীচে কয়েকশ, বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে এই চুনাপাথর আছে। চুনাপাথরের স্তর ষাট ফিট পুরু। চুনাপাথরের যে খনি অঞ্চলটি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে তার অবস্থান জয়পুরহাট এলাকায়। এখান থেকে বাৎসরিক দশলক্ষ টন চুনপাথর তোলা যাবে। চুনাপাথরের এক বিরাট অংশ ব্যবহৃত হবে সিমেন্ট তৈরীর কাজে।

সিলেটে ট্যাকেরঘাট এলাকায় যে চুনাপাথর আছে তাও ওই ইওসিন যুগের। এই চুনাপাথর দিয়ে বর্তমানে ছাতকের কারখানায় সিমেন্ট তৈরী হয়।

সেন্ট মার্টিন দ্বীপে প্রবালজাত যে চুনাপাথরের সন্ধান পাওয়া গেছে তার পরিমান প্রায় আঠারো লক্ষ টন। এ চুনাপাথর যদি এই দ্বীপ থেকে নিয়ে আসা হয় তাহলে সেণ্টমার্টিন দ্বীপটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সেখানকার বারশো অধিবাসীকে দ্বীপ থেকে তার আগে অন্যত্র সরাতে হবে। কিন্তু আঠারো লক্ষ টন চুনাপাথরের জন্যে বাংলাদেশের মানচিত্র তথা পৃথিবীর মানচিত্র থেকে সেণ্টমার্টিন দ্বীপকে মুছে ফেলার অধিকার আমাদের আছে কি?

প্রাকৃতিক গ্যাস ।।

পাললিক শিলায় আবৃত আমাদের দেশ। গ্যাস প্রাকৃতিক নিয়মে সংরক্ষিত হয় এই শিলায়। বাংলাদেশে যে গ্যাস পাওয়া গেছে তার বেশীর ভাগই প্রায় বিশুদ্ধ মিথেন। মিথেন দ্বারা গঠিত ভূ-বিদেরা

তেলের খোঁজ করতে যেয়ে এই গ্যাসের সন্ধান পান। এক দুই করে কয়েক জায়গায় এই গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই গ্যাসের মোট প্ররিমাণ বিষয়ে মাপজোক করে ১৯৬৮ সালের মাঝামাঝি নাগাদ দেখা যায় যে মোটামুটি ভাবে এই গ্যাসের পরিমাণ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিটের হিসেবে সর্বমোট ৮·২৩ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট। এর মধ্যে সিলেট গ্যাসফিল্ডে ০·২৪ ছাতকে ০.০২ রশিদপুরে ১.০৬, কৈলাসটিলা ০·৬০, তিতাস ২·২৫, হবিগঞ্জ ১.২৮, এবং বাখরাবাদে ২·৭৮।

এই পরিমাণ গ্যাস আমাদের দেশের চাহিদা কয়েক দশক ধরে মেটাতে পারবে। অন্তত আগামী ৩০ থেকে ৪০ রছর আমরা এই গ্যাস ব্যবহার করতে প্রারবো। ১৯৭২ সালের এক হিসেবে বলা হয়েছে, এ পর্যন্ত যে পরিমাণ গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে তা প্রায় দশ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিটের মত। এ ছাড়া আরও গ্যাস পাবার সম্ভাবনা আছে।

কেউ কেউ এই গ্যাস বিদেশে রপ্তানীর কথাও বলেছেন তবে আমাদের ধারণা রপ্তানী করাটা কোন মতেই উচিত হবে না। এই গ্যাস দিয়ে আমাদের দেশের চাহিদা অনুযায়ী পেট্রোকেমিক্যাল দ্রব্যাদির কারখানা গড়ে তোলা উচিত এবং চাহিদা অনুযায়ী প্লাসটিক, রেজিন, কৃত্রিম রাবার, কৃত্রিম আঁশ, কীটনাশক ঔষধ এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য তৈরীর ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। এ ছাড়া ঘরবাড়ীতে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা থেকে শুরু, বিভিন্ন কারখানাতে এর ব্যবহার আমরা আগামী কয়েক দশক চালিয়ে যেতে পারবো। এর মধ্যেই ফেঞ্চুগঞ্জ সারকারখানা ছাতক সিমেন্ট কারখানা এবং ঘোড়াশাল সার কারখানায় এই গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে যে পরিমাম গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে, তা থেকে আমরা যদি গ্যাস বিদেশে রপ্তানী করতে শুরু করি, তাহলে কিন্তু এই গ্যাস নিঃশেষ হতে বেশী দিন লাগবেনা। একটা উদাহরণ দেওরা যেতে পারে। বিশ কোটি লোকের দেশ যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে প্রতি পাঁচ মাসে প্রায় আট ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট গ্যাসের ব্যবহার হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে কত বিপুল পরিমাণ গ্যাস অন্যদেশে পাওয়া গেছে তারও উল্লখ করা যেতে পারে। ১৯৬৮ সাল নাগাদ রাশিয়াতে ৩৪৩ ট্রিলিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ২৮৭ ট্রিলিয়ন ঘন ফুট গ্যাসের সন্ধান

পাওয়া গেছে। এই বিপুল পরিমাণ সঞ্চিত গ্যাস শুধু মাত্র ওই দুই দেশের প্রায় পঁয়তাল্লিশ কোটি লোকের ব্যবহারের জন্যে। এই সব দিক বিবেচনা করে আমাদের দশ ট্রিলিয়ন ঘন ফুট গ্যাসের সবটুকু দিয়েই দেশের উন্নতির কথা চিন্তা করতে হবে। ভূ-বিদদের সন্ধান চালিয়ে যেতে হবে আরও নতুন গ্যাস ফিল্ডের জন্যে। আর সেই অনুসন্ধানের ফলশ্রুতিতে হয়ত আমরা তেলও পেয়ে যেতে পারি। যদি আমরা কোন উল্লেখযোগ্য পরিমাণের "অয়েল ফিল্ডের" সন্ধান পাই তবে বাংলাদেশের মানুষ এক নতুন দিগন্তের সন্ধান পাবে।

শ্বেতকাদা ।।

উত্তর ময়মনসিংহের বিজয়পুর এবং তার আশ-পাশের এলাকায় এক কালে শিলার ফেলস্‌পার (feldsper) মিনারালের বিচুর্ণীভবনের (weathering) মাধ্যমে ধীরে ধীরে (white clay) বা শ্বেতকাদার উৎপত্তি হয়। এই শ্বতকাদা প্লায়োসিন (pliocene) কালের। প্লায়োসিন কাল শুরু হয়েছিল এক কোটি ত্রিশ লাখ বছর আগে এবং এখন থেকে প্রায় দশ লাখ বছর আগে সেই কালের সমাপ্তি ঘটেছে।

ময়মনসিংহের শ্বেতকাদা খুব উন্নতমানের না হলেও এটা আমাদের মৃৎশিল্পে (ceramic industy) ব্যবহৃত হচ্ছে। বিজয়পুরে দুই লক্ষ টন শ্বেতকাদার সন্ধান পাওয়া গেছে। এই শ্বেতকাদা থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নত মানের মৃৎশিল্প গড়ে তোলা সম্ভব।

কাঁচাবালি ।।

আমাদের দেশ কাঁচ শিল্পের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ আছে। ভাল কাঁচের জন্যে প্রয়োজন উন্নত মানের কাঁচবালি বা (glass sand) এর। সিলেটে শাহাজি বাজার, মানিকপুর প্রভৃতি এলাকায় এবং উত্তর ময়মনসিংহের বালিজুড়িতে যে কাঁচবালির সন্ধান পাওয়া গেছে তা দিয়ে রঙীন কাঁচের শিল্প গড়ে তোলা লাভজনক হবে। বস্তুত আমাদের কাঁচের কারখানাগুলোতে দেশী বালির ব্যবহার হচ্ছে। সিলেটের ল লঘাট এলাকায় মাটির একশো ফিট মত নীচে শতকরা ৯৯ ভাগ সিলিকা সম্বলিত যে কাঁচবালির সন্ধান পাওয়া গেছে তা দিয়ে দেশে ভাল সাদা কাঁচ তৈরী করা সম্ভব।

ভারীবালি ।।

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে এবং উপকূলবর্তী দ্বীপ সমূহে যে

heavy mineral বা ভারীবালি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রুটিল, ইলমেনাইট জারকন, ম্যাগনেটাইট এবং মোনাজাইট।

তেজস্ক্রিয় ভারীবালি হলো মোনাজাইট—এর মধ্যে বা থোরিয়াম অক্সাইড থাকে। থোরিয়াম আনবিক শক্তির একটি উৎস। ইলমেনাইট থেকে পাওয়া যায় উইটেনিয়াম। ইলমেনাইট এবং রুটিল রঙ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। চটগ্রানের ইস্পাত কারখানায় ম্যাগনেটাইটের কিছু ব্যবহার সম্ভব। এক কথায় বলা যেতে পারে সমুদ্র সৈকতের ভারীবালি থেকে বিভিন্ন ধরনের শিল্প সম্ভবনা উজ্জল।

শক্ত পাথর।।

Hard rock বা শক্ত পাথর রাস্তা, রেল লাইন, ব্রিজ প্রভৃতি বানানোর কাজে আসে। আমাদের দেশের প্রায় সবটাই নরম মাটিতে ঢাকা। তাই এর উপরিভাগে কোথাও কোথাও সামান্য নুড়ি পাথর ছাড়া অন্য কোনো শক্ত পাথর নেই। দিনাজপুরে তিনটে পাশাপাশি নদী রয়েছে। তাদের নাম মহানন্দা, করতোয়া ও সাউন। এ তিনটি নদীর তীরে তেঁতুলিয়া, ভজনপুর ও পঁচাগড় নুড়ি পাথর কুড়িয়ে জীবিকা নির্বাহ করে কিছু লোক। তারা কোন দিনই সে নুড়িতে পরশ পাথর পাবে না। কিন্তু দেশ গড়তে হলে, দালান কোঠাতে, রাস্তা তৈরীর কাজ করতে হলে নুড়িপাথর—পরশ পাথর বিশেষ। দিনাজপুরের এ নুড়িপাথর আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় কম। তবে দেশে hard rock বা শক্ত পাথর আমাদের ভূ-বিদগণ পেয়েছেন। এই শক্ত পাথর, ভূমির উপরিভাগে নুড়িপ্রাথরের মত ছড়িয়ে নেই। এ পাথরের সন্ধান বাংলার নরম মাটির নিচে পাওয়া গেছে। রংপুরের রানীপুকুর সেই জায়গা। ড্রিলিং করে ভূমির ৫৬২ ফিট নীচে এই শক্ত আগ্নেয়শিলা ও রূপান্তরিত শিলার (igneous and metamorphic rocks) সন্ধান পাওয়া গেছে। আমাদের এ শিলা উত্তোলন করতেই হবে—গড়তে হবে রংপুর-দিনাজপুর এলাকায় আরেকটি খনি অঞ্চল। আগামীতে যখন এই শক্ত পাথর খনি থেকে উঠানো শুরু হবে তখন দেশে শক্ত পাথরের চাহিদা দেশের জিনিস দিয়েই মিটবে। ভূগর্ভস্থ এই আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলায় আমরা কোনদিন কোন আকরেরও সন্ধান পেয়ে যাই তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। সেই আকরে মূল্যবান কোন ধাতুও থাকতে পারে।

এবার কাদামাটির দেশের কাদার কথায় আসা যাক। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব এবং পূর্বাঞ্চলের কিছু কিছু এলাকা বাদে বাকী সবটুকুকেই কাদামাটির দেশ বলা চলে। ভূবিদ্যার ভাষায় কাদামাটি নরম পাথর বিশেষ। একে উত্তপ্ত করলে শক্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরীপ বিভাগ (USGS) কাদা বা clay সম্বন্ধে একটা সংগা দিয়েছে এই ভাবে —"A natural substance or soft rock which, when finely ground and mixed with water, forms a a pasty, moldable mass that preserves its shape when air dried, the particles soften and coalesce upon being highly heated and form a stony mass upon cooling ......"

প্রকৃতি নদী-বিধৌত বাংলাদেশকে নরম কাদা দিয়েছে অফুরন্ত। এই নরম কাদা থেকে শক্ত ইট হয়, ইটকে আরও পড়িয়ে হয় ঝামা। কাদা সম্বন্ধে যখন মানুষের খুব একটা বৈজ্ঞানিক ধারণা ছিলনা তখনো ময়েনজোদাড়োতে আধুনিক কালের মত বড় আকারের ইট দিয়ে ইট দিয়ে সেখানকার অধিবাসীরা শহর গড়ে তুলেছিল।

কাদা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যতটা উন্নত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশে কাদা এক বিরাট সম্পদ। দেখা গেছে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে পোড়ানোর উপযোগী যে কাদা পাওয়া যায়, তাকে ১৮০০ থেকে ১৯০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে বিশ থেকে তিরিশ মিনিটকাল পোড়ালেই তা ঝামা বিশেষে পরিণত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের কাদাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট তাপে পুড়িয়ে যে শিল্প (Lightweight aggregate industry) গড়ে উঠবে তার ভবিষ্যৎ বিরাট। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত—ওজনে হাল্‌কা অথচ শক্ত এই ঝামা দিয়ে নরম মাটির ওপর মজবুতভাবে বিভিন্ন নির্মাণ কাজ আমরা সম্পন্ন করতে পারবো।

পরিশেষে এ কথা বলা যায়—কোটি কোটি বছরে প্রকৃতি বাংলাদেশের বুকে যে প্রাকৃতিক সম্পদ সঞ্চয় করে লুকিয়ে রেখেছিল আজ তা জাতির কল্যানে, মানুষের কল্যানে আহরণের দিন এসেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে আমাদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা করতে হবে এবং সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে এগিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশের অন্যতম ভূ-বিদ ডঃ ফৈয়াজ হোসেন খান জামালগঞ্জ—জয়পুরহাট এলাকায় যে "বাংলা-

দেশের "শেফিল্ড" গড়ে তোলার কথা বলেছেন তা আমাদের বাস্তবায়িত করতে হবে।

তথ্যপঞ্জী

Ameen, Ahmdul, 1972, Natural Gas Reserve in Bangladesh—is It Enough for Export ? Seminar '72, Chemical Engineering Department, BUET.

Hasan, Manzor, 1973, Scope for Geology in Bangladesh : The Bangladesh Observer, January 22.

Khan, F. H., 1972, Iron & Steel Works in North Bangladesh : Seminar '72, Chemical Engineering Department, BUET.

———, 1972 Progress of Mineral Development in Bangladesh : Seminar '72, Chemical Engineering Department, BUET.

Maroof Khan, 1972, Lightweight Aggregate Industry : The Bangladesh Observer, April 8.

Qudrat-I-Khuda, Biswas, M. A., and Basak, A. K., 1962, Studies of Some Clays of East Pakistan : Symposium on Industrial Rocks and Minerals, CENTO.

অধ্যাপক মঞ্জুর হাসান

নাট্যান্দোলনের নাটক

আন্দোলন কথাটা শুনলে আজকাল অনেকের—এই আমাদেরই, কেমন যেন বিরক্ত লাগে। মনে হয়, কেবল কথার জন্যে কথা বলা অথবা ঠোঁটের কথা—ওষ্ঠাগ্রেই যা সীমাবদ্ধ। আন্দোলন কথাটার প্রতি এই অনীহা কেন এর কারণ নিরূপন করতে গেলে রীতিমত বৈজ্ঞানিক গবেষনার প্রয়োজন। তবে অত গভীরে না গিয়েও বলা যায় যে অন্যান্য আরো অনেকগুলো শব্দের মতই ব্যবহারে ব্যবহারে আন্দোলন কথাটি একটি Cliché তে পরিনত হয়েছে। যা যত বেশী বলা হয় এবং সেই বহুল উচ্চারিত শব্দ যদি Tangible কোন বস্তু না হয়। অর্থাৎ তা যদি আমাদের নিত্যকার ক্রিয়াকর্মে এখন-তখন প্রয়োজনে না পড়ে, তাহলে সে শব্দ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। আর ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেই তা পল্‌কা হয়ে যায়, গাম্ভীর্য বিচ্যুত হয় এবং অবশেষে Cliché তে রূপান্তরিত হয়।

ভাত, কাপড়, জল, কল, মাংস অথবা মাছ ইত্যাদির লক্ষবার ব্যবহারেও তা Cliche' হয় না কারণ এগুলো ছাড়া আমাদের চলে না। এগুলো প্রয়োজনীয় Tangible বস্তু।

যখন আন্দোলন কেবল আর মুখের কথা থাকবে না, যখন আন্দোলন কথার একটা অর্থ চারধারে চোখ ফেরালেই আমরা খুঁজে পাবো. যখন আন্দোলন যথার্থই আন্দোলনের রূপ নেবে তখন অনেকেই আর বিরক্তি প্রকাশ করবেন না আন্দোলনের কথায়, নাসিকা কুঞ্চিত করবেন না শব্দটি শুনলে।

আন্দোলনকে জনপ্রিয় করতে এলে, আন্দোলনকে জনগণ দ্বারা গ্রহণ করতে হ'লে সর্বাগ্রে তাই আন্দোলন শুরু করা প্রয়োজন। নাটকের ব্যাপারেও নিশ্চয়ই এ' কথাটি প্রযোজ্য হওয়া উচিত। তবে নাটকের ব্যাপারে আরও একটু গোলমাল রয়ে গেছে। যেহেতু নাটক মানুষের জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে একটি নয় ; যেহেতু মানুষের শারিরীক প্রয়োজন মেটাতে নাটকের প্রয়োজন নেই ; নাটক কেবল মনের ক্ষিধে মেটাতে প্রয়োজন "হলেও হতে পারে", সেহেতু মানুষের কাছে তার মনোগত প্রয়োজনে নাটককে একটি গ্রহণযোগ্য শিল্পকলায় রূপান্তরিত না করলে আন্দোলন আদৌ শুরু হবে কিনা এ' বিষয়ে যথেষ্ঠ সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। অবশ্য মনের প্রয়োজন অর্থাৎ মানসিক-ক্ষুধা Rationalityর অপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে আমাদের নিজেদের Rationalityর পরিমাণ পরিমাপান্তে ধার্য্য করা প্রয়োজন—কিন্তু সে তো গেলো তত্ত্বকথা। আসলে আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন নাট্যান্দোলনকে আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতে আমাদের দেশের জনগণের দ্বারা গ্রহন করানো। আর তাই প্রথমেই প্রয়োজন নাট্যান্দোলন শুরু করা—আন্দোলনের নাটক দিয়ে।

আন্দোলনের নাটক কেমন হবে? এইখানে প্রথমেই একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, যে কোন শিল্পকলা আন্দোলনের মাধ্যমে জনপ্রিয় করা অবশ্যই একটি গতিশীল (Dynamic) কার্যক্রম। এবং সে গতি সামনে এগিয়ে যাওয়ার পেছনে হটার নয়। সুতরাং জনপ্রিয়তার ছুতোয় বস্তাপচা ওঁচা শিল্পকার্য স্বভাবতই এই আলোচনা বহির্ভূত থাকবে। তবু আরেকটু সাবধানী হয়ে কেবল নাট্যান্দেলন না বলে নবনাট্যান্দোলন বলবো। আর তা ছাড়া একশ' বছরে মর্চে পড়া চক্রকে ঘোরাতে আন্দোলনের প্রয়োজনেই নবনাট্যের নাটকের প্রয়োজন—আমার অতীতকে উপেক্ষা করেই-কাজেই—কাকে বলা যায় নবনাট্যের নাটক?

অভিনয়ার্থে যে নাটকের জন্য (কারন সাহিত্যের অলঙ্কার হিসেবেও নাটক আছে) সে নাটকের দুটি মূল স্তম্ভ অভিনয়ের প্রয়োজনে লক্ষ্যনীয়—শৈলী এবং প্রতিপাদ্য। কি লেখার ঢঙ, কি সংলাপে কি মঞ্চায়নে এই দুই স্তম্ভে ভর করেই নাটক দণ্ডায়মান। এবং নবনাট্যের নাটক নির্বাচনে এই দুই বিষয়ের ওপর গুরুত্ব অর্পন করা প্রয়োজন।

নবনাট্যের নাটকে শৈলী কেমন হবে? প্রতিপাদ্য কি থাকবে?

রচনা শৈলী, উপস্থাপনা-শৈলী এই দুই বিষয়েই সমগ্র বিশ্বে আজ পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে। প্রতিপাদ্যেও আজকে অনেক নতুন নতুন ধারা এসেছে। নতুন চিন্তা এসেছে। এসেছে দারিদ্র অভাব আর লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান। এসেছে বিতশ্রদ্ধ উদ্ভ্রান্ত তারুন্যকে প্রতিপাদ্য করে। মঞ্চ যেন শিল্পীর ক্যানভাস। কেউ তাতে গড়ে তোলেন প্রকৃতিতে ঠিক যেমনটি দেখেন—পারিপার্শ্বিকতার ঠিক যে বিষয়টি তাঁর মনে দোলা দেয় সে বিষয়টি। আবার কেউ তাঁর মনের বিরুদ্ধ চেতনাকে, তাঁর উদভ্রান্তিকে, তাঁর অস্থির চিত্তকে চিত্রায়িত করেন ক্যানভাসে। অঙ্কন শৈলীতেও পার্থক্য বিদ্যমান। কেউ পরিমিত রঙেয় ব্যাবহারে সদৃষ্ট দৃশ্যাবলী আঁকেন বিষয়বস্তুতে উৎকীর্ণ রঙের পরিমিতিতে। আবার কেউ বিভিন্ন রঙের ব্যবহারে মনের রঙের দোলা দিয়ে যান দৃশ্যপটের ওপর।

নাটকের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। আজকে প্রতীচ্যের নাটমঞ্চে বিভিন্ন চিন্তা—বিভিন্ন কর্মের আমদানী হয়েছে। এ সবের সংজ্ঞা তৈরী হয়েছে।

হেনরিক ইবসেন আনলেন রিয়েলিজম্—গোর্কী, শেকভ শৈলীর দিক দিয়ে ইবসেনের উত্তরসূরী, প্রতিপাদ্যে পার্থক্য (বিভেদ) থাকলেও। ইতালিয় নাট্যকার ল্যুইজি পিরানদেল্লো এই রিয়েলিজমকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি একটি নিত্যদৃষ্ট ঘটনা অথবা জীবনের সংঘাতকে মঞ্চে তুলে ধরলেন—প্রথম দর্শকের সামনেই মঞ্চ সাজিয়ে—চরিত্র পরিচিত দিয়ে। অর্থাৎ "হে দর্শকবৃন্দ এ' ঘটনা তোমরা অহরহ দেখছো—আমিও দেখেছি—কিন্তু আমি মঞ্চে অভিনয় করে তোমায় দেখাচ্ছি এ' ঘটনা। তোমরা যে কেউ এই নাটকের চরিত্র হতে পারো ভুলে যেও না।" বের্তল্ত ব্রেখ্‌শট তাঁর নাটকে নিয়ে এলেন আরেক বিপ্লব। তিনি দর্শককে মঞ্চে টেনে আনার বিরোধী ছিলেন। অর্থাৎ দর্শক কেবল দর্শক—নাটকের অংশ নয়। দর্শককে চিন্তা করার, নাটকের পরিনতি নিয়ে মাথা ঘামাবার সুযোগ দেয়া উচিৎ। ব্রেখ্‌শট শুরুতে কিছুটা ভাবালুতাশ্রয়ী (Nostalgic Romantic) থাকলেও পরবর্তী কালে মঞ্চের মধ্যমে 'শিক্ষাদানে' ব্রতী হয়েছিলেন। সেজন্যে ব্রেখ্‌শটকে অনেকে Didactic playwrite বলেন। ব্যাক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী—চেতনা থেকে সৃষ্ট হ'ল নাটকে সু-রিয়েলিজম। আনেকের মতে সুরিয়েলিজম দাদাইজম'এর উত্তরসূরী। অনেক নাট্যগুরুদের মতে সুরিয়েলিজম, এক্সপ্রেশনিজম,

সিম্বলিজম, কনস্ট্রাক্টিভিজম, ফ্যাণ্টাসি ইত্যাদি—চরিত্রগত দিক দিয়ে এবং বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে নন-রিয়েলিজম অথবা থিয়েটারিক্যালিজম এর অন্তর্গত। অর্থাৎ মূল হচ্ছে নন-রিয়েলিজম এবং এগুলো তার শাখা প্রশাখা। স্যামুয়েল বেকেট আর ইয়োনেস্কো আনলেন 'থিয়েটার অব দ্য এ্যাবসার্ড'। টি, এস এলিয়েট নবজন্ম দিলেন কাব্য নাটকের। মঞ্চে ফরাসি ফ্যান্টাসির দ্বারোদ্ঘাটন করলেন এডমণ্ড রোষ্ট্যাণ্ড ও মরিস ম্যায়েটারলিঙ্ক। তারপর ফরাসী ইমপ্রেসনিজম এবং জার্মান এক্সপ্রেশেনিজম ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই যখন প্রতীচ্যের মঞ্চের অবস্থা, তখন—আমাদের বাংলাদেশে আমরা নাটক শুরু করা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্থ। নবনাট্যের নাটক কি হবে তাই নিয়ে বিরোধের অন্ত নেই। আমরা হয় শস্তা মেলোড্রামা অথবা সাধারন্যের জন্য গুরুপাক রূপক নিয়ে বিভ্রান্ত। আমরা অন্যান্য অনেক বিভ্রান্তির মতই নাটকেও দুই মেরুর মধ্যে দ্রুত ধাবমান। কোন মধ্যপন্থা কি বার করা যায় না? বস্তুত, আন্দোলনের প্রয়োজনে আমাদের মধ্যপন্থার খোঁজে ব্রতী হওয়া প্রয়োজন।

আসলে আমাদের ন্যায় অনুন্নত দেশে জনসাধারনের মৌলিক সমস্যাগুলো সুরচিত—সুসংঘবদ্ধ নাট্যকর্মের মাধ্যমে মঞ্চে উপস্থাপন করলেই আমরা সুস্থ—স্বাভাবিক নাট্যান্দোলন গড়ে তুলতে পারবো। উপস্থাপনায় নব্য দৃষ্টিভঙ্গী আনয়নে ক্ষতি নেই। শৈলিতে গবেষণামূলক নতুনত্ব সংযোজিত হলে নবনাট্যের নাটক অবশ্যই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবে কিন্তু প্রতিপাদ্যে আমরা যেন কোনক্রমেই আত্মকেন্দ্রীক হয়ে না পড়ি। সাবজেক্টিভ সমস্যার মঞ্চরূপ দোষনীয় নয়। তবে তা অবশ্যই নবনাট্যান্দোলনের নাটক হবে না। কারণ দর্শক একাত্ববোধ না করলে সে নাটক মঞ্চসফল নাটক হতে পারে না। তাই, প্রথমেই আন্দোলনমুখ নাট্যকর্মীদের নির্ণয় করা প্রয়োজন নাটকের জন্যেই নাটক করবো না আন্দোলনের জন্য?

—আলী যাকের

বাংলাদেশের খেলাধুলা

যাত্রা সম্ভবত: অনেক আগেই শুরু হয়েছিল, যদিও তার সঠিক কোন দিনপঞ্জী নেই। উনিশশো সাইত্রিশ সালে ঢাকার বৃষ্টিস্নাত এক নিদাঘ অপরাহ্নে বিশ্বখ্যাত আইলিংটন কোরিন্থিয়ান্স ফুটবল দলকে হারিয়ে এ দেশের খেলাধুলার প্রথম স্বীকৃতি ঘটে। তখন বৃটিশ আমল। সারা দেশে জেলা ক্রীড়া সংস্থা আর সংস্থার মাঠ সবে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। বৃটিশ জাতের যত দোষই থাকুক না কেন তাদের একটা গুণ অনেক দোষকে ঢেকে দেবে সন্দেহ নেই। এ গুণটা হচ্ছে খেলাধুলার প্রতি তাদের ভালবাসার, আকর্ষন ও ঐকান্তিকতা। তারা জাতীয় জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে মানবিক জীবনে এই খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা বুঝেছিল। যার জন্য আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টার চেয়ে তাদের খেলাধুলার প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি ক্রীড়া সংস্থা আর ক্রীড়া সংস্থার মাঠ গঠন বা তৈরী করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

আমাদের দেশের খেলাধুলার এই প্রথম পর্ব আরো একজন অসামান্য খেলোয়াড়ের অনন্য ক্রীড়ানৈপুন্য খেলাধুলাকে আমাদের দেশে জনপ্রিয় করে তোলে। অনন্য ক্রীড়ানৈপুন্যের অধিকারী সেই অসামান্য খেলোয়াড় যাদুকর সামাদ আজ আমাদের খেলাধুলা ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। আর সেই চোখ ধাঁধানো মনজুড়ানো খেলা যে কত অসংখ্য মনুষকে মাঠের দিকে টেনে ছিল তার কোন হিসেব নেই। বৃটিশ সরকার চেষ্টাচরিত্র করলেও সত্যি বলতে কি খেলাধুলার প্রতি আমাদের দেশের মনুষের দৃষ্টি ভঙ্গি অপরিবর্ত্তিত থাকায় এর কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। খেলাধুলা আমাদের দেশে ঢিমে তেতলা ভাবে চলতে থাকে।

বৃটিশ আমলে আমাদের দেশে (তখন পুর্ব বাংলা) খেলাধুলার প্রতি বেশ অনিহা দেখালেও এখানকার বহু খেলোয়াড় কোলকাতার মাঠে খেলে সুনাম কুড়াতো। শুধু তাই নয়, এখানকার খেলোয়াড়রা যারা কোলকাতার মাঠে খেলতো তারা তাদের আশানুরূপ ক্রীড়ানৈপুন্য দিয়ে ঝড় তুলতো। বিশেষ করে ফুটবল খেলাটাই এখানে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিল। অন্যান্য সব খেলা অনুষ্ঠিত হলেও তা এদেশের মানুষের কাছে তেমন পরিচিত হয়ে উঠতে পারেনি। ফুটবল খেলা প্রায় সব খানেই হোত। ক্রিকেট খেলা হোত দেশের বিশেষ কয়েকটি জায়গায়। রমনা রেস কোর্সের ঢাকা ক্লাব মাঠে জেলা ক্রীড়া সংস্থা মাঠে চট্টগ্রাম ও সিলেটের বালিশেরা ক্লাব মাঠে ইউরোপীর সাহেবরা শীতকালে বেশ জোলুস সহকারে ক্রিকেট ম্যাচ খেলতেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরের বছর অলিম্পিক বছর। পাকিস্তানের জাতীয় হকি দল অংশ নিল তাতে। জাতীয় দল শুধু নামেই, কারণ দলের সব খেলোয়াড় পশ্চিম পাকিস্তানের। চার বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কমিটির সদস্য হয়ে পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দল প্রথম সরকারী ক্রিকেট সফরে গেল ভারতে। জাতীয় ক্রিকেট দলের সমস্ত খেলোয়াড় পশ্চিম পাকিস্তানের। এদিকে বার্মা, সিংহল, ভারত ও পাকিস্তানকে নিয়ে কোয়াড্রেঙ্গুলার ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা শুরু হয়েছে বছর বছর। ঢাকা সারা বাংলাদেশ নয় সারা পাকিস্তানের ফুটবলের প্রানকেন্দ্র। অথচ জাতীয় ফুটবল দল যখন গঠন হোল দেখা গেল একজন কি দুজন খেলোয়াড় নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তখন 'জাতীয়তা আর দেশ প্রেমে' এতই উদ্বুদ্ধ যে কেউই সেদিকে খেয়াল করতাম না। এমনি করেই ভারতীয় ক্রিকেট দল প্রথম সফরে এলো পাকিস্তানে। পাকিস্তান ক্রিকেটের ইতিহাসে নিজের দেশে এটাই প্রথম সরকারী সফর। প্রথম সরকারী প্রথম শ্রেনীর ক্রিকেটম্যাচ ,বিদেশী দলের সাথে চট্টগ্রামে প্রথম সরকারী টেষ্ট ঢাকায়। সেই ঢাকা শহরে যেখানে একটা ক্রিকেট লীগ খেলা দেখতে পাঁচশোর বেশী দর্শক পাওয়া যেতনা, প্রথম সরকারী ক্রিকেট টেষ্ট দেখার জন্য খেলা শুরুর একঘণ্টা আগেই ঢাকা কাঠের গ্যালারীর ষ্টেডিয়াম পঁচিশ হাজার দর্শকে পূর্ণ। বাংলাদেশের খেলাধুলার ইতিহাসে সে এক অভাবনীয় মুহূর্ত্তে। খেলা শুরু হবে হবে। হাজার হাজার দর্শকের সাথে আমরাও কৈশোরের সেই উৎসুক্য নিয়ে মাঠের

দিকে তাকালাম। আম্পায়ার নামলো, খেলোয়াড় নামলো, দূরে স্কোরার স্কোরবোর্ড পাল্টানোর মানুষ সব কিছু—পশ্চিম পাকিস্তানী। ঢাকা ষ্টেড়িয়াম খেলা অথচ ঢাকার কোন খেলোয়াড়, আম্পায়ার, স্কোরার কিছুই নেই। এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আর কখনো হয়েছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু অমরা নির্বিকার। বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন উদীয়মান ও প্রতিজ্ঞাবান ক্রিকেট খেলোয়াড় ও দর্শক হয়ে সে খেলা দেখেছেন। অথচ সুযোগ সুবিধা পেলে এরা এদের ক্রীড়াযোগ্যতা দেখিয়ে ঢাকা ষ্টেডিয়ামের পঁচিশ হাজার দর্শকের মন ভরিয়ে দিতে পারতেন। পারতেন বাঙালী কৃতিত্ব দিয়ে ঢাকার মাঠে—ইতিহাস সৃষ্টি করতে।

এরপর আসে এম সি সি দল। আঞ্চলিক খেলাগুলিতে বিভিন্ন অঞ্চলের খেলোয়াড় খেলালেও চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক খেলায় এ দেশের ক'জন খেলোয়াড় কেনিয়ে দলের অর্দ্ধেক গঠন করা হলো লাহোর আর করাচীর খেলোয়াড় নিয়ে। শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরন করলো সে দল। তরুন খেলোয়াড় ড়াঃ কামাল দক্ষ ব্যাটিং ও আথার নিপুন বোলিং করে এম সি সি খেলোয়াড়দের তাক লাগিয়ে দিলেও পাকিস্তানী নির্বাচক মণ্ডলী সে নৈপুন্যকে খেয়ালই করলেন না। উনিশশো বাহান্ন সালে ভারত সফর শেষে পাকিস্তান ক্রিকেট দল বর্মা সফরে গেলে সেখানে ডাঃ কামালকে নিয়ে যায়। ডাঃ কামাল উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান হিসাবে পুরো দলের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাটিং দক্ষতা দেখালেও নির্বাচন মণ্ডলীর কাছে তা কোন আমলই পায় না। কয়েকটি দল এদেশ ঘুরে যাওয়াতে ক্রিকেট খেলাও বেশ জনপ্রিয়তা পায়। প্রথম বিদেশী হকি দল আসে জার্মান। বিদেশী দলের বিরুদ্ধে প্রথম এদেশী খেলোয়াড় খেলার সুযোগ পান বশির আহমদ। ঢাকা আরমানিটোলা স্কুলের এক সময়ের ছাত্র বশির সত্যিই একজন তুখোর হকি ও ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। কেনিয়ার বিরুদ্ধে ঢাকা মাঠে একটি খেলায় অসামান্য ক্রীড়ানৈপুন্য দেখানোই কর্তৃপক্ষ ঢাকা টেষ্টে তাকে খেলার জন্য মনোনীত করতে বাধ্য হন।। টেষ্টের পূর্বের খেলায় বশির তার দ্রুত ও ক্ষীপ্রগতিতে বল নিয়ে যাওয়া, সহযোগীদের নিখুঁত ব্যাক পাস, থ্রু অথবা স্কোয়ার পাস দিয়ে খেলানো ও তার দর্শনীয় ষ্টিকওয়ার্ক সেদিন ঢাকা মাঠের পুরোনো দর্শকদের এককালিন সেরা খেলোয়াড় ইউসুফ রেজার কথা স্মরন করিয়ে দিয়েছিল। নিজের

মাঠ আর দর্শকের সামনে এ ভাবে খেলার সৌভাগ্য আর কোন খেলোয়াড়ের হয়েছে কিনা সন্দেহ। পরের খেলা টেষ্ট পাকিস্তান বনাম কেনিয়া। বশিরকে বাদ দেওয়ার সাহস হোলনা। দল নির্বাচনে কোন চাল মারতে না পারায় পশ্চিম পাকিস্তানীরা অন্যপথ ধরলো। খেলোয়াড়দের বলে দেওয়া হোল একে যেন ঠিকমত বল দেওয়া না হয়, আর দিলেও এমন ভাবে যেন দেওয়া হয় যাতে সে বল ধরতে না পারে। কেনিয়ার অধিনায়ক আতারসিং সেদিন শুধু বশিরকে রুখবার জন্য রাইট ব্যাক থেকে লেপট ব্যাকে এসেছিলেন। কিন্তু ভাগ্য সেদিন অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। ক্রীড়া রাজনীতির জঘন্য ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বশির টেষ্ট ভাল খেলতে পারলেন না—হারিয়ে গেলেন পাকিস্তান হকি থেকে—যে রকম নাকি পাকিস্তান ফুটবল থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন মারী, আরজু, মিণ্টু, আশরাফ, ওয়াজেদ প্রভৃতি অসংখ্য খেলোয়াড় মুক্তা, আনজাম, আনোয়ার, রশিদ তারাপদ এর মত অসংখ্য খেলোয়াড় অবস্থা আর অবহেলার শিকার হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেলেন। এদিকে শুধু ঢাকা নয়, বাংলাদেশের (তখন পূর্ব পাকিস্তান) আনাচে কানাচে ক্রিকেটের জোয়ার এসে ঠেকেছে। ক্রিকেটের জনপ্রিয়তার পরিধি বাড়ছে। কিন্তু এদেশের খেলোয়াড় আর খেলার অঙ্গন পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানীরা এদেশে কিছু দালাল সৃষ্টি করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেশ কিছু খেলোয়াড় (যাদের অধিকাংশই মাকরনী) আমদানী করে ঢাকায় খেলানো। পশ্চিম পাকিস্তানী এদেশে আমদানীর প্রধান দুটো কারণ হোল এখানের উদীয়মান ও প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের উঠতে না দেওয়া আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আসার পথে জুতো মোজা বলের ভিতর ভ'রে সোনা পাচার করা। আমাদের দেশেয় লেখা ধুলার জীবনে সে এক দুঃখজনক দিন।

এত দুঃখ দুর্দিনের মধ্যে ও আশার আলো দেখা গেল। সে আলোর দিশারী হলেন অনন্য অসামান্য ক্রীড়া সংগঠক এস এ মোহসিন। বাংলাদেশের বিভিন্ন খেলাধুলা সংগঠনে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। পশ্চিম পাকিস্তানীরা এ ষড়যন্ত্রের কথা বুঝতে পেরে সাঁতারের দিকে ঝুঁকলেন। আলোড়ন সৃষ্টি করলেন বিশ্বক্রীড়াজগতে। জনাব মোহসিন তার মানসপুত্র ব্রজেনকে দিয়ে ছ'বার ইংলিশ চ্যানেল পার করে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। মোহসিন ব্রজেনের কৃতিত্বে বাংলাদেশের ক্রীড়া

জগতে নতুন আশার আলো দেখা গেল। মোহসিনের অসামান্য ক্রীড়া সংগঠনী কৃতিত্বে ঢাকার ছেলে ব্রজেন দাস বিশ্বের সেরা সাঁতারুর স্বীকৃতি পেল। সত্যি বলতে কি অসংখ্য নদ নদী বিধৌত আমাদের এ দেশ থেকে অগনিত সাঁতারু বের হবে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। এ দেশে মায়ের পেট থেকে পড়েই ছেলেমেয়েরা সাঁতার শেখে। সাঁতার তাদের শিখতে হয় জীবন ধারনের জন্য। সাঁতার শিখতে হয় প্রান ধারনের প্রয়োজনে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। সরকারী অবহেলার ফলে সাঁতার আর অন্যান্য খেলার মত খেলা হিসাবে সন্মান পেলনা। পশ্চিম পাকিস্তান বালুকাঁকর ধুধু বিস্তীর্ণ অঞ্চল। হাজার হাজার মাইলের মধ্যে সেখানে জলাশয় পাওয়া কঠিক তারা এ দেশের সাঁতারের প্রতি অবহেলা ও উদাসিনা দেখাবে এতে আশ্চর্য্য কি। শুধু তাই নয়, যেখানে কোন জলাশয় নেই, নেই সাঁতারের পাট ঠিক সেই পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপিত হোল দেশের সাঁতারের সদর দফতর। তবুও সেই অবহেলা আর ঔদাসিন্যকে এড়িয়ে ব্রজেনর পর আবদুল মালেক ইংলিশ চ্যানেল পার হলেন।

এতদিন ধরে আমরা যা করেছি বা যে পথে চলেছি তা সবই ভুল। ক্রীড়া সংগঠনে মারাত্মক ভুল ছিল যার জন্য খেলাধুলার সেই আরাধ্য স্থানে আমরা যেতে বা পেঁৗছাতে পরিনি। খেলাধুলার প্রতি বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ধরে আমাদের প্রত্যেকের পূর্বতন সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি তা আজ বদলাতেই হবে। পাশ্চাত্য দেশ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। গ্রহণ করতে হবে তাদের খেলাধুলার দৃষ্টিভঙ্গি। জাতীয়-জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, মানবিক জীবনে খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। পশচাত্য দেশ গুলি তা গ্রহণ করে বিপুল ভাবে লাভবান হয়েছে। এর পরেও পাশ্চাত্য এ শিক্ষা গ্রহণ করতে আমরা কেন এত দ্বিধাগ্রস্ত বলতে পারিনা। একমাত্র খেলাধুলার মাধ্যমেই সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান রাষ্ট্র গড়া সম্ভব, অন্যথায় নয়। আমাদের দেশ ও সমাজের প্রতিটি মানুষের—খেলাধুলার প্রতি পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। বদলাতে হবে সরকারকেও। আমাদের প্রধান কাজ হবে খেলাধুলার উন্নয়ন কে সমস্যা কে একটি বিরাট আন্দোলনে গড়ে তোলা। এ আন্দোলন কে ছড়িয়ে দিতে হবে প্রতিটি মানুষের মাঝে, গ্রাম—গ্রামান্তরে। প্রতিটি মানুষকে বোঝাতে হবে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা। একই সঙ্গে উদ্যোগ নিয়ে একে কার্য্যকরী করার জন্য সরকারী ভাবে প্রকৃষ্ট

ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের মত গরীব দেশে সরকারী উদ্দোগ ও প্রচেষ্টা ছাড়া সত্যিকার ভাবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। পাকিস্তানী আমলে শিক্ষা বিভাগের অর্ন্তভুক্ত করে খেলাকে একটা সাধারন করে চালানো হোত তা গোঁজামিলেরই নামান্তর ছাড়া কিছু নয়। এতদিন যে কাঠামো, যে ভিত এর উপর আমাদের খেলাধুলা পরিচালিত হোত তা সম্পূর্ন ত্রুটি পূর্ণ। এই ত্রুটির জন্য বছরের পর বছর ধরে আমরা খেলাধুলা উন্নয়নের জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছি তা বিফল হয়েছে। এছাড়া পশ্চিমাদের বঞ্চনা, শোষন ও অবহেলায় সাফল্য তো দূরের কথা তাতে আমাদের শুধু ব্যর্থতারই প্রাসাদ গড়েছে। পাকিস্তানী আমলের ২৪টা বছর ছিল আমাদের দেশ ও জাতির পক্ষে এক দুঃস্বপ্নের সময়। এ সময়ে আমরা এত বেশী ভুল করেছি তা বলার নয়।

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশেকে আরো সুস্থ ও আরো মজবুত করতে হলে প্রায়ই তার খেলাধুলার উন্নয়নের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। খেলাধুলাকে আর শিক্ষা দফতরের অপাংতেয় অংশ করে রাখা চলবেনা। খেলাধুলার জন্য নুতন পৃথক দফতর চাই—যে দফতর দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা আমাদের দেশের খেলাধুলা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারবে। বাংলাদেশের জন্য ক্রীড়া দফতর অবশ্যই থাকতে হবে। তারপর দেশের খেলাধুলাকে পুনর্গঠনের কাজে উৎসর্গ করে আমাদের সকলের আরধ্য স্বপ্ন সফল করতে হবে।

বাংলাদেশের প্রতিটি শিশু জন্মেই স্বপ্ন দেখে সে বড় খেলোয়াড়, বড় সাঁতারু বা বড় এথেলেট কিছু হবে। এতদিন তা অবাস্তব মনে হলেও তাকে আজ বাস্তব করা কঠিন হবেনা। সুন্দর পরিকল্পনা, সুষ্ঠু উদ্যোগ ও নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় তা গড়ে তুলে ধরাব জন্য সরকার ও বাংলাদেশের মানুষের কাছে যে চ্যালেঞ্জ এসেছে তা মোকাবেলা করতেই হবে। এই মোকাবেলার সাফল্যের উপর আমাদের সমগ্র বাংলাদেশ ও তার ভবিষ্যত অনেক খানি নির্ভর করছে।

—মুহম্মদ কমরুজ্জামান

সূচীপত্র

সমাজ বিজ্ঞানঃ বাংলাদেশে/বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর। বাংলাদেশের ভূমি সংস্কার / আবদুস সালাম। সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং ভাষা /রনেশ দাশ গুপ্ত। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পটভূমি/আলী মনোয়ার। বাংলাদেশের সাহিত্য/ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। বাংলাদেশের কবিতাঃ পালাবদলের ভূমিকা/আহসান হাবিব। বাংলাদেশের ছোট গল্প/মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যের ধারা ও সমস্যা/ সন্তোষ গুপ্ত। বাংলাদেশের শিশু সাহিত্য/আলী ইমাম। ভাষ ও সংস্কৃতির বাহনঃ বাংলাদেশের সংবাদ পত্র/ আহম্মদ হুমায়ুন। বাংলাদেশের বিজ্ঞান চর্চা/ মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক সম্পদ/অধ্যাপক মঞ্জুর হাসান। নাট্য আন্দোলনের নাটক/আলী যাকের। বাংলাদেশের খেলাধূলা / মুহাম্মদ কামরুজ্জামান।